ভয়ঙ্করের মুখোমুখি

১-২. ঘন্টা বাজার আগে

ঘন্টা বাজার আগেই ঝন্টুর পরীক্ষার খাতা লেখা শেষ হয়ে গিয়েছিলো। ভূগোল পরীক্ষা নিয়ে কখনও ওর মাথা ব্যথা থাকে না। তবে ভালো মতো রিভাইজ না দিতেই পরীক্ষার শেষ ঘণ্টা বাজলো। এমনিতে প্রথম পাঁচজনের ভেতর প্লেস না থাকলেও ভূগোলের জুলিয়ান স্যার ওর আঁকা ম্যাপ ক্লাসের ফার্স্ট সেকেণ্ড বয়দের দেখিয়ে বলেন, এস এস সিতে ভূগোলে যদি নব্বইয়ের ওপর নম্বর তুলতে চাও ঝন্টুর মতো ম্যাপ আঁকতে শেখো। সামনে কিছু না বললেও আড়ালে ফার্স্ট বয় আতিক আর সেকেণ্ড বয় বিমল মুখ বাঁকিয়ে বলে, ভারি তো ম্যাপ আকিয়ে! তাও যদি কোনওবার ফিফথও হতে পারতো।

বাড়িতে ঝন্টুর বাবা কখনও ফাস্ট সেকেন্ড হওয়ার জন্য আতিক আর বিমলের বাবার মতো হইচই করেন না। ঝন্টুর বাবা বলেন, আশির ঘরে নম্বর পেলেই আমি খুশি। তা তুই ফাস্ট হলি না লাস্ট হলি তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।

ঝন্টুদের মিশনারি স্কুলের পড়াশোনার এমন কড়াকড়ি যে, ক্লাস এইট, নাইন, টেন-এ যারা দশের ভেতর থাকে তাদের কারও নম্বরই গড়ে আশির কম নয়।

ঘন্টা বাজার পর খাতা জমা দিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলো ঝন্টু। ওদের সিট পড়েছিলো জুবিলি স্কুলে। স্কুল জীবনের শেষ পরীক্ষা দিয়ে ওর মনে হলো বুকের ওপর থেকে হিমালয়ের মতো ভারি একটা বোঝা নেমে গেছে। গত একটা বছর কী ধকলই না গেছে ওদের ওপর দিয়ে। নাইনে থাকতে সারা স্কুলের কর্তা ছিলো ওরা। পিকনিক, মিলাদ, সরস্বতী পুজো কিংবা সায়েন্স ফেয়ার সব কিছুর তদারকি করে নাইনের ছেলেরা। টেনে ওঠার পর সব বন্ধ। মাথার ওপর তখন এস এস সির তলোয়ার ঝোলানো থাকে। স্কুলের পর ওদের কোচিং ক্লাস, কারও আবার বাড়িতে দু তিনটে টিচার আসেন–দম ফেলার সময় থাকে না। জানে একটু বেতাল হলে স্টার কেন, ফার্স্ট ডিভিশনেও নাম থাকবে না। আর এসএসসিতে ওদের স্কুলের যে সব ছেলের ফার্স্ট ডিভিশন থাকে না, তারা লজ্জায় মুখ তুলে তাকাতে পারে না। দু বছর আগে এক ছেলে সেকেণ্ড ডিভিশন পেয়ে ঘুমের বড়ি-টড়ি খেয়ে এক কেলেঙ্কারি ঘটিয়েছিলো।

ঝন্টুর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সুমন বললো, সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছিলি?

ঝন্টু নির্লিপ্ত গলায় বললো, না পারার কী আছে! ও সুমনের কাছ থেকে অন্য কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছিলো।

একটু পরে সুমন সেই কথাটা বললো, রবিকে আসতে বলবো?

ঝন্টু মুখে একটা নিরাসক্ত ভাব এনে বললো, ও কি আসতে চাইছে?

বারে তোকে সকালে বললাম না রবি তোর সঙ্গে কথা বলতে চায়!

স্কুলের বন্ধুদের ভেতর রবি সবচেয়ে কাছের হলেও ওর সঙ্গে ঝন্টুর ঝগড়াও হয় বেশি। মাস ছয়েক আগে জুবিলি স্কুলের সঙ্গে ফুটবল খেলতে গিয়ে রবি নাকি ইচ্ছে করে ঝন্টুকে পাস না দিয়ে নিজে মারতে গিয়ে নির্ঘাত গোলটা নষ্ট করেছে। খেলায় যদিও ওরা জিতেছিলো, খেলার পর ঝন্টু রবিকে কথা শোনাতে ছাড়ে নি আমার হ্যাটট্রিক হবে, সেটা বুঝি তোর সহ্য হচ্ছিলো না!

রবিও ছেড়ে কথা বলার পাত্র নয়–ভারি তো এলেন হ্যাটট্রিক করনেওয়ালা। তোকে যে ওদের লেদু মার্কিং-এ রেখেছিলো এটুকু খেয়াল নেই, তুই করবি হ্যাটট্রিক!

লেদুর মতো দু তিনটেকে ডজ দেয়া কোনও ব্যাপারই না।

থাক থাক, দেখা আছে! ফার্স্ট হাফে পেনাল্টি মিস করে বড় বড় কথা বলিস না।

ওয়ার্ল্ড কাপের স্টাররাও পেনাল্টি মিস করে।

তবে আর কী। ওয়ার্ল্ড কাপে খেললেই পারিস।

রবির বাঁকা বাঁকা কথা শুনে ঝন্টুর মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিলো–তোকে টীমে রাখলে আমি আর খেলবো না–এই বলে রাখলাম।

তোর সঙ্গে খেলতে আমার বয়ে গেছে।

আমার সঙ্গে আর কথা বলবি না তুই।

তোর সঙ্গে কথা না বললে বুঝি আমার ভাত হজম হবে না? নাকি রাতে ঘুম হবে না?

দুদিন পরই তো ভাব জমাতে আসবি!

বয়ে গেছে তোর সঙ্গে ভাব জমাতে।

শেষের দিকে কথা বলতে গিয়ে ঝন্টুর গলা ধরে এসেছিলো, চোখ ফেটে কান্না আসছিলো। রবি ওর সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারে এটা ও ভাবতেও পারেনি।

পরদিন ছুটির পর ঝন্টুর নাকের ডগা দিয়ে বিমলের সঙ্গে গলাগলি করে বাড়ি গেলো রবি। অন্য দিন ঝন্টুর জন্য দরকার হলে এক ঘন্টাও দেরি করে। ছুটির পর ঝন্টুর স্কাউটিং ক্লাস থাকে। রবি বকুল তলায় বসে ঝন্টুর পিটি প্যারেড আর অন্য সব কসরৎ দেখে। তারপর দুই বন্ধু এক সঙ্গে বাড়ি ফেরে।
স্কাউটিং-এর সুবাদে সুমনের সঙ্গে ঝন্টুর বন্ধুত্ব হয়েছে। তবে সুমন পড়ে ইংলিশ মিডিয়ামে, গাড়িতে করে স্কুলে আসে যায়, ঝন্টু ওকে রবির মতো ভাবতে পারে না। সুমনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়াতে ঝন্টুর লাভ হয়েছে গল্পের বইয়ের ব্যাপারে। সুমনের ঘরে আলমারি ভর্তি বাংলা-ইংরেজি এ্যাডভেঞ্চার আর রহস্যের বই যা ঝন্টু পেলে গোগ্রাসে গেলে।
তবু রবির সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করার পর সুমনই ওর কাছের বন্ধু। টিফিন পিরিয়ড ও রবিকে দেখিয়ে সুমনের সঙ্গে কাটায়। আর রবি ছুটির পর বিমলের কাঁধে হাত রেখে বাড়ি যায়। মাঝে মাঝে ঝন্টুর বুক ঠেলে কান্না আসতে চায়, কারণ স্কাউটিং ক্লাসের পর ওকে বাড়ি ফিরতে হয় একা।
জুবিলি স্কুলের সঙ্গে খেলার এক সপ্তাহ পরে ঝন্টুদের ফ্রেন্ডলি ম্যাচ ছিলো পগোজ স্কুলের সঙ্গে। খেলার দুদিন আগে ওদের ফুটবল ক্যাপ্টেন কামাল বললো, রবি যদি না খেলে তুই খেলবি তো ঝন্টু?
ঝন্টু বললো, রবি খেলবে না কেন?
তোকে টিমে রাখলে ও খেলবে না বলছে।
ওকে নিলেই তো পারিস?
তোর চেয়ে কি ও ভালো খেলে?
ও তো তাই মনে করে।
ও মনে করলে তো হবে না। আমি ক্যাপ্টেন। আমি রবিকে বলে দিয়েছি তুই খেলবি।
প্রথমে ঝন্টু খুব উত্তেজিত ছিলো রবিকে জব্দ করতে পেরেছে বলে। পরদিন প্র্যাকটিসের সময় ওর মনে হলো এতদিন রবির সঙ্গে খেলে দুজনের যে বোঝাঁপড়া হয়েছে সেটা মনিকে দিয়ে হবে না। প্র্যাকটিসের পর কামালকে জানিয়ে দিলো পগোজ স্কুলের সঙ্গে ও খেলবে না।
কামাল অবশ্য এ নিয়ে বেশি উচ্চ বাচ্য করে নি। কদিন ধরে টিফিনে মোগলাই পরোটা খাইয়ে সবুজ ওকে পটাচ্ছে স্ট্রাইকারের পজিশনে একটা চান্স দেয়ার জন্য। রবির জায়গায় মনিকে নামিয়েছে কামাল। ঝন্টুর জায়গায় সবুজকে নিলো। খেলার দিন মনি খুশি হয়ে কামালকে একটা টি শার্ট প্রেজেন্ট করে বসলো, যদিও খেলায় ওরা এক গোলে হেরেছিলো। তবে ফ্রেণ্ডলি ম্যাচ বলে রবি আর ঝন্টুর না খেলার ব্যাপারটাকে কেউ সিরিয়াসলি নেয়নি।

ঝন্টু চান্স পেয়েও কেন খেললো না–রবির খুব জানতে ইচ্ছে করছিলো। সুমনকে ঝন্টু প্র্যাকটিসের দিনই বলেছিলো রবিকে ছাড়া ওর খেলতে ইচ্ছে করছে না। সুমনের কাছে পরে কথাটা শুনে রবির মনে হলো ঝন্টু ছাড়া আসলেই ওর কোনও বন্ধু নেই। তার পর থেকে যত দিন যাচ্ছিলো কিভাবে ঝন্টুর সঙ্গে ভাব করবে তাই নিয়ে ভাবছিলো রবি। ক্লাস নাইনে থাকতে একবার এরকম হয়েছিলো। সাত দিন না যেতেই ঝন্টুর খাতার ভেতর ও চিঠি রেখেছিলো–তোর সঙ্গে ভাব করতে চাই, লিখে। রবি একবার ভেবেছিলো ঝন্টুকে চিঠি লিখবে। পরে এরকম চিঠি লেখাটা ওর ছেলেমানুষি মনে হয়েছে। কী করবে কোনও পথ খুঁজে না পেয়ে সুমনকেই ধরেছিলো ঝন্টুর সঙ্গে ভাব করিয়ে দেয়ার জন্য। সুমন বলেছে, পরীক্ষা শেষ হলে বলবে।

সেদিন সকালে সুমন যখন কথাটা পাড়লো ঝন্টুর ইচ্ছে হলো দোয়েল পাখি হয়ে আকাশে ডিগবাজি খেতে। পরীক্ষার পড়া তৈরি করার ফাঁকে ও নিজেও ভাবছিলো কেমন করে রবির সঙ্গে ভাব করা যায়। পরীক্ষার পর তিন মাস সারা জীবনের সেরা ছুটি। রবিকে ছাড়া লম্বা ছুটি ও কাটাবে কি ভাবে? তারপরও সুমনকে ওর মনের ভাব বুঝতে দেয়নি। নির্লিপ্ত গলায় শুধু বলেছে, পরীক্ষা আগে শেষ হোক।

পরীক্ষার পর সকালের জের ধরে কথাটা ঝন্টুর কাছে আবার পাড়লো সুমন। বেশ কিছুক্ষণ কোনও কথা বললো না ঝন্টু। ওর মনের ভাব বাইরে প্রকাশ পেলে সুমন আদেখলে ভাবতে পারে। কথাটা দ্বিতীয়বার বলার পর ঝন্টু বললো, ঠিক আছে, আসতে বল রবিকে।

ঝন্টুকে বকুল তলায় রেখে সুমন গেলো রবিকে ডাকতে। শেষ পরীক্ষা দিয়ে সবাই বাড়ি যেতে পারলে বাঁচে। মিনিট দশেকের ভেতরই স্কুল প্রায় খালি হয়ে গেছে। রবি একা দাঁড়িয়েছিলো ফুটবল খেলার মাঠের কাছে। সুমন ওকে বললো, রবি চল, ঝন্টু তোকে ডাকছে।

রবির বুকের ভেতর তখন প্রচণ্ড উত্তেজনা। কান খাড়া করলে সুমন ওর হার্টবিট শুনতে পেতো। উত্তেজনা চেপে রবি জানতে চাইলো, সত্যি সত্যি ডাকতে বলেছে, না তুই বানিয়ে বলছিস?

গেলেই বুঝবি ও ডাকছে না আমি বানিয়ে বলছি!

চল, গিয়ে দেখি। নিজেকে ওর প্রজাপতির মতো হালকা মনে হলো।

ঝন্টুর কাছে গিয়ে রবি কী বলবে ভেবে কিছু ঠিক করতে পারলো না। মনে হলো সব কথা দলা পাকিয়ে গলার কাছে এসে আটকে আছে। ঝন্টুর চোখে চোখ পড়তেই রবি আরও গুটিয়ে গেলো। সুমন অবাক হয়ে বললো, তোরা কথা বলছিস না কেন?

ঝন্টু দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালো রবির দিকে–তোর সঙ্গে সেদিন খুব খারাপ ব্যবহার করেছি রবি। আমি দুঃখিত।

ঝন্টুর হাত চেপে ধরে রবি ধরা গলায় বললো, আমি নিজেও অনুতপ্ত ঝন্টু। আর কখনও এমন হবে না।

সুমন হেসে বললো, বাহ, ভাবতো হয়েই গেলো। তোরা বোস। আমি বাদাম কিনে আনি।

সুমনের স্কুলের গেটের পাশে বাদাম ওয়ালার কাছ থেকে বাদাম কিনতে গিয়ে চোখে পড়লো রাস্তার ওপাশে ওদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার রাজা আলি নিবিষ্ট মনে খবরের কাগজ পড়ছে। বাদাম কিনে সুমন রাস্তা পেরিয়ে রাজাকে গিয়ে বললো, বাবা কখন গাড়ি চেয়েছেন?

রাজা ওর হাত ঘড়ি দেখে বললো, আইজ তিনি অফিসে লাঞ্চ খাইবেন। বলছেন ঠিক পাঁচটায় যাইতে।

রাজা আলীকে প্রথম দেখে সুমনের মনে হয়েছিলো ওর মতো একজন সুদর্শন যুবক সিনেমায় না নেমে ড্রাইভার কেন হলো। মনে হয়েছে ও কখনও ছবিতে চান্স পাবে না কথার গ্রাম্য টানের জন্য।

সুমন ওকে বললো, তাহলে আমি এক ঘন্টা পরে যাবো।

আপনের ইচ্ছা হইলে থাকেন। বলে রাজা খবরের কাগজে মন দিলো।

সুমন বাদাম নিয়ে বকুল তলায় এসে দেখে রবি আর ঝন্টুর মুখে কথার ফুলঝুরি আর হাসির ফোয়ারা।

সুমন মুখ টিপে হেসে বললো, ছ মাসের জমে থাকা কথা কি এক দিনে শেষ হবে?

ঝন্টু হাসতে হাসতে বললো, রবিকে বলছিলাম এত লম্বা ছুটি ও কিভাবে কাটাবে। বলে ন্যাড়া হয়ে নাকি ঘরে বসে থাকবে।

সুমন অবাক হয়ে বললো, ন্যাড়া হবি কেন রবি? বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হওয়ার ইচ্ছে নেই তো?

আরে না! লজ্জা মেশানো গলায় রবি বললো, সেজো ভাইয়ের মাথার চুল সব পড়ে যাচ্ছে। বাবা বলেছেন ওকে ন্যাড়া হতে। ভাইয়া বায়না ধরেছে আমি যদি ন্যাড়া হই, তাহলেই ও ন্যাড়া হবে। আমি বলেছি, হতে পারি একশ টাকা পেলে। ভাইয়া রাজী হয়ে গেছে।

ঝন্টু আদুরে গলায় বললো, তোর ভাইয়াকে বল না রবি, আমি পঞ্চাশ পেলেই রাজি!

কী জন্য রাজি?

ন্যাড়া হতে।

ঝন্টুর কথা শুনে রবি আর সুমন এক সঙ্গে হেসে উঠলো। হাসির শব্দে বকুল গাছ থেকে এক ঝাঁক চড়ুই উড়ে গেলো। জুবিলি স্কুলের দপ্তরি বুড়ো কৃষ্ণপদ কোথায় যেন যাচ্ছিলো। ছেলেদের হল্লা দেখে বিরক্ত হলো পরীক্ষা শ্যাষ, বাড়ি না গিয়া বড় যে ইশকুলে বইসা রইছ?

কৃষ্ণপদকে ওরা সবাই চেনে বদমেজাজি ভালো মানুষ হিসেবে। সুমন হাসতে হাসতে বললো, মনেই হচ্ছে না আমাদের স্কুল লাইফ শেষ হয়ে গেছে। বাদাম খাবে কেষ্টদা?

আমারে পোলাপান পাইছ, বড় যে বাদাম খামু?

রবি বললো, একটার ঘন্টা বাজলেই আমরা বাড়ি যাবো।

কৃষ্ণপদ আপন মনে বক বক করতে করতে চলে গেলো। সুমন বললো, ছুটি কাটানোর কথা বলছিলি। তোরা কি কোথাও যাওয়ার প্ল্যান করছিস?

রবি ঠোঁট উল্টে বললো, বললেই কি যাওয়া যায়? বাবা বলেছেন বেড়াতে ইচ্ছে করলে গ্রামের বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে।

ঝন্টু বললো, তিন মাস লাগবে রেজাল্ট বেরুতে। এ কদিন কি ঘরে বসে মাছি মারবো?

তুই কি করবি?

করার কিছু ভাবিনি বলেই তো জানতে চাইছি কারও মাথায় কোনও প্ল্যান আছে কি না।

সুমন বললো, তোরা কি দুজনে মিলে কিছু করতে চাইছিস, না আমিও নাক গলাবো?

ঝন্টু গম্ভীর হওয়ার ভান করলো–তোর নাক ক্লাসে সবার চেয়ে বড়। যেখানে ইচ্ছে তুই নাক গলাতে পারিস।

শুধু যদি বের করার কায়দা জানিস। যোগ করলো রবি।

সুমন হেসে বললো, ভালো হয় বিকেলে যদি আমাদের বাড়িতে আসিস। তিন জন মিলে এর ভেতর ভেবে ঠিক করবো ছুটির দিনগুলোতে কী করা যায়। আসবি তো?

আসতে পারি, যদি তোর মার হাতে বানানো সেদিনের মতো সিঙাড়া খাওয়াস। এই বলে ঝন্টু রবির দিকে তাকালো, এত মজার সিঙাড়া তুই জীবনেও খাসনি।

ঠিক আছে মাকে বলবো। সুমন উঠে দাঁড়ালো–তোরা কি আরও বসবি? আমার গাড়ি এসে গেছে।

ঝন্টুও উঠে পড়লো–বিকেলে তোর বাড়িতে যেতে হলে এখন আর গেঁজিয়ে কী লাভ!,

সুমন চলে যাওয়ার পর রবি আর ঝন্টু বহু দিন পর আগের মতো একে অপরের কাঁধে হাত রেখে বাড়ির পথে রওনা হলো। কাগজিটোলা হেঁটে যেতে মিনিট পনেরো লাগে। গলির ভেতর তিন নম্বর বাড়ি ঝন্টুদের, আর সাত নম্বর হচ্ছে রবিদের।

হাঁটতে হাঁটতে ঝন্টু বললো, আমার মনে হচ্ছে কতদিন তোর সঙ্গে কথা বলি না!

মৃদু হেসে রবি বললো, ভাগ্যিস সুমন ছিলো। নইলে কতদিন এভাবে থাকতে হতো কে জানে! সুমনের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতায় ওদের মন ভরে গেলো।

ঝন্টুদের বাড়িতে মানুষ মাত্র তিনজন। ঝন্টু, ওর বড় বোন ঝুমনি, যে জগন্নাথ কলেজে বাংলায় থার্ড ইয়ার অনার্সে পড়ে আর ওদের বাবা আরিফ আহমেদ, যিনি জগন্নাথে ইংরেজি পড়ান। ঝন্টুর মা মারা গেছেন ও যখন ক্লাস থ্রিতে পড়ে। বাবা আর বুমনি দুজনের আদর কখনও ওকে মার অভাবের কথা মনে করতে দেয় নি।

রবিদের বাড়িতে চার ভাই তিন বোনের ভেতর ও সবার ছোট। ওর বাবা জজকোর্টে ওকালতি করেন, সংসার মন্দ নয়। রবির জন্মের পর থেকে ওর মা নানা রকম অসুখে ভুগে খিটখিটে স্বভাবের হয়ে গেছেন, দিনের অর্ধেক বেলা বিছানায় পড়ে থাকেন। সংসার সামলানোর দায়িত্ব ওর মেজ ফুপুর। বারো বছর আগে ফুপা মারা গেছেন, ওর কোনও ছেলে মেয়ে নেই। ছোট বেলায় রবির বাবাকে এই ফুপু কোলে পিঠে মানুষ করেছেন, তাই ফুপা মারা যাওয়ার পর থেকে ভাইয়ের সংসারই ওঁর সংসার, ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের নিজের ছেলেমেয়ের মতো দেখেন।

রবি বাড়িতে ঢুকেই ফুপুকে পেলো সামনে। ফুপু, ভাত দাও, বলে সটান নিজের ঘরে ঢুকলো। পুরো ঘরটা ওর নয়। ওর তিন বছরের বড় সেজ ভাই হবি যে এবার ফাস্ট ইয়ারে পড়ে, সেও এই ঘরে থাকে। তবে দুই ভাইয়েরই আলাদা বিছানা পড়ার টেবিলও আলাদা।

বাথরুমে ঢুকে ঝটপট মুখ হাত পানিতে ভিজিয়ে রবি খাবার ঘরে ঢুকলো। ওদের বাড়িতে ছুটির দিন ছাড়া সবার এক সঙ্গে খাওয়া হয় না।

ঝন্টুদের বাড়িতে দুপুরে না খেলেও রাতে ওরা তিনজন এক সঙ্গেই খাবে। বুয়া যত ভালো রান্না করুক বুমনি রোজ ছোট ভাইর পছন্দের একটা পদ নিজের হাতে রান্না করে। হালে ঝন্টুর কাবাব খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। রান্নার বই দেখে দেখে একেক দিন একেক রকমের কাবাব বানায় ঝুমনি।

বিকেলে রবির ডাকে বাড়ি থেকে বেরুবার সময় কুমনি যথারীতি বললো, সাতটার মধ্যে বাড়ি ফেরা চাই।

ঝন্টু দুঃখ পাওয়া গলায় বললো, তুই কী রে আপু! আজ এস এস সি পরীক্ষা শেষ হলো। বলতে গেলে এখন আমি কলেজ স্টুডেন্ট। আজও সাতটায় ফিরতে হবে?

ঠিক আছে আটটায়। ঝন্টুকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঝুমনি বাইরের দরজা বন্ধ করে দিলো।

সুমনদের রামকৃষ্ণ মিশন রোডের বাড়ি যেতে যেতে রবি বললো, কী করবি কিছু ভেবেছিস ঝন্টু?

নারে! খেয়ে উঠেই আপুর সঙ্গে দাবা নিয়ে বসলাম। দুটো গেম হেরে মাথা ঠিক নেই। তিনজন এক সঙ্গে কোথাও গেলে কেমন হয় রবি?

কোথায় যাবি?

আমার সমুদ্র দেখার ভারি ইচ্ছে। কক্সবাজার যাবি?

সমুদ্র আমিও দেখিনি। তবে কক্সবাজার যেতে কত টাকা লাগবে জানিস?

তোর বাবাকে বললে দেবেন না?

বাবা আপত্তি না করলেও মা চেঁচামেচি করবেন।

কথা বলতে বলতে কাগজিটোলা থেকে হেঁটে হেঁটেই ওরা সুমনদের বাড়ি পৌঁছে গেলো। ঝন্টুকে অবশ্য ঝুমনি রিকশাভাড়ার জন্য দশ টাকা দিয়েছিলো। অর্ধেকটা ওর বেঁচে গেলো।

কক্সবাজার যাওয়ার পরিকল্পনা সুমন অপছন্দ করলো না। কক্সবাজার জায়গাটা অবশ্য ওর কাছে নতুন নয়। বাড়ির সবার সঙ্গে আগেও দুবার ও কক্সবাজার গেছে। তবে এতটা বয়স হলো, বড়দের ছাড়া একা ওর কোথাও যাওয়া হয়নি। তিন জন কক্সবাজারে গেলে মজাই হবে।

.

২.

ঠিক হয়েছিলো ওরা কোচে করে কক্সবাজার যাবে। ঢাকা থেকে নাইট কোচে উঠলে সকালে কক্সবাজার নামিয়ে দেয়। রবির বাড়ি থেকে কেউ আপত্তি করেনি। শুধু বাবা বলেছেন, যাওয়া আসার বাস ভাড়ার জন্য শ তিনেক টাকা দিতে পারি। কদিন থাকবে, কোথায় উঠবে, কী খাবে এসব ব্যবস্থা করতে পারবো না।

রবি জানে এত ভাই বোন না হলে ঝন্টুর মতো ওর বাবাও এক কথায় দেড় দু হাজার টাকা বের করে দিতেন। ঝন্টু অবশ্য রবিকে বলেছে, তুই ভাবছিস কেন? আমার দু হাজার টাকায় দিব্যি দুজনের চলে যাবে। চাই কি টেকনাফ থেকেও ঘুরে আসতে পারবো। সস্তা হোটেলে উঠলেই চলবে।

রবির তবু দ্বিধা কাটেনি—সুমন কি সস্তা হোটেলে থাকতে রাজী হবে?

যাচ্ছি সমুদ্র দেখতে টাকার গরম দেখাতে নয়। সুমনের যদি সস্তা হোটেল পছন্দ না হয় পর্যটনের মোটেলে থাকুক গে। আমরা আমাদের মতো থাকবো।

যেদিন ওরা যাওয়ার প্ল্যান করলো তার দুদিন পর সুমন ওদের দুর্ভাবনার কথা শুনে হেসে খুন হলো–তোরা এত ভাবছিস কেন? কক্সবাজারের ডিসি বাবার বন্ধু। আমরা সার্কিট হাউসেই থাকতে পারবো। কম পয়সায় রাজার হালে থাকা যায়। এক রুম হলেই। তো আমাদের চলে যাবে।

ঝন্টুর বাবা প্রথমটায় একটু চিন্তিত ছিলেন–পনেরো ষোল বছরের ছেলে, বড়দের ছাড়া এতটা পথ যাবে! সেই চিন্তাও দূর হলো শেষ মুহূর্তের ব্যবস্থায়। হঠাৎ করে সুমনের বাবার কাজ পড়ে গেলো চট্টগ্রামে। প্লেনে টিকেট পাওয়া গেলো না। ঠিক করলেন পরদিন ভোরে গাড়ি নিয়ে চলে যাবেন। সুমন শুনে বললো, তাহলে তো তুমি আমাদের চিটাগাং পর্যন্ত লিফট দিতে পারো।

হ্যাঁ, তা পারি। তবে তারা যে পরশু যাবি বলে ঠিক করলি। আমি তো যাবো কাল।

আমি এখনই গিয়ে ঝন্টু আর রবিকে গিয়ে বলছি। কাল আর পরশু আমাদের কাছে সমান।

সুমনের বড় ভাই সুজন পড়ে ইউনিভার্সিটিতে। বললো, যেখানে যেতে হয় রিকশায় যাও। গাড়ি আমার লাগবে। সুমনের এভাবে কক্সবাজার যাওয়াটা ওর পছন্দ হচ্ছিলো না। ওকে পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে হবে আর সুমন সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে বেড়াবে একেবারে অসহ্য মনে হচ্ছিলো ওর।

রিকশায় করেই প্রথম ঝন্টুদের বাসায় এলো সুমন। ঝন্টুর বাবা অফিস থেকে ফিরে চা খাচ্ছিলেন। যে কারণে ঝন্টুদের যাওয়া একদিন এগিয়েছে, শুনে তার দুশ্চিন্তা কেটে গেলো। সুমনকে বললেন, খুব ভালো হয়েছে–তোমরা তোমার বাবার সঙ্গে যাচ্ছো।

গাড়িতে যাওয়ার কথা শুনে রবিও খুশি হলো। তবে ওর আরও সমস্যা ছিলো। ভেবেছিলো কাল সকালে ওর জিন্সের প্যান্ট দুটো ধুয়ে দেবে। ওদের বাড়িতে যে যার কাপড় নিজেই দেয়। রাতে থোয়াটা ওর সমস্যা নয়, সমস্যা হচ্ছে সকালে শুকোবে কি না।

সুমন আর ঝন্টুর বিদায় হতেই ও বাথরুমে কাপড় কাঁচতে বসলো। ওর বাইরে পরার মতো প্যান্ট মাত্র দুটো। এক সেট পায়জামা পাঞ্জাবি অবশ্য আছে, যা মিলাদ টিলাদে যেতে হলে পরে।

কাপড় ধোয়ার পর ফুপু বুদ্ধি দিলেন, রান্না ঘরে মেলে দে। ভোর না হতেই শুকিয়ে যাবে।

রবিরা নিজেদের ধোয়া কাপড় নিজেরাই ইস্ত্রি করে। ফুপুর কথা শুনে রবি নিশ্চিন্ত হলো। তবে ভোরে ও ঘুম থেকে উঠে দেখলো, প্যান্ট দুটো আর তিনটা শার্ট ইস্ত্রি করা অবস্থায় ওর টেবিলের ওপর রাখা। রবি বুঝলো এ কাজ ফুপু ছাড়া আর কারও নয়। কাল রাতে ও শুনেছে ফুপু মাকে বলছেন, এইটুকুন

তিনটে ছেলে কক্সবাজার যাবে, বড় কেউ সঙ্গে থাকবে না–ভারি চিন্তা হচ্ছে। মা জবাব দিয়েছেন, দুনিয়াটা বড় কঠিন জায়গা বুবু। এখন থেকে সব কিছু চিনতে শিখুক, নইলে পদে পদে হোঁচট খেতে হবে।

সকাল সাতটায় ইস্ত্রি ভাঙা প্যান্ট শার্টের ওপর হাত কাটা সুয়েটার গায়ে দিয়ে এয়ার ব্যাগ কাঁধে যখন রবি ঘর থেকে বেরুতে যাবে ফুপু ওর হাতে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট গুঁজে দিলেন– এটা রাখ। ক্ষিদে লাগলে পথে কিছু কিনে খাস।

রবি কখনও যা করে না–টুপ করে ফুপুর পা ছুঁয়ে সালাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। ঝন্টুকে সঙ্গে নিয়ে পৌনে আটটায় পৌঁছে গেলো সুমনদের বাড়ি।

সুমন তৈরি হয়ে ড্রইং রুমে অপেক্ষা করছিলো। ওদের দুজনকে মৃদু হেসে সম্ভাষণ জানালো–তোরা পনেরো মিনিট আগে এসে গেছিস।

.

ঢাকা থেকে সকাল আটটায় রওনা দিয়ে ঠিক একটায় ঝন্টুরা পৌঁছলো চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে। পথে মেঘনার ফেরিতে দেরি না হলে আরো আধঘন্টা আগে পৌঁছতে পারতো ওরা।

সুমনের বাবা বলেছিলেন চট্টগ্রামে তিনি ওদের সঙ্গে লাঞ্চ করবেন আর এই গাড়িই ওদের কক্সবাজার নামিয়ে দিয়ে সকালে ফিরে আসবে। তিনি পরদিন বিকেলে ঢাকা ফিরবেন। এও বলেছেন সুমনরা যেন আট দশ দিনের বেশি কক্সবাজার না থাকে।

লাঞ্চের জন্য সুমনের বাবা সবাইকে নিয়ে গেলেন আগ্রাবাদ হোটেলে। এত দামী হোটেলে রবি কেন, ঝন্টুও কখনও খায়নি। রবির ভয় হচ্ছিলো, যদি কাঁটা চামচ দিয়ে খেতে হয় বিপদে পড়তে হবে। কোন হাতে কাঁটা আর কোন হাতে ছুরি ধরে এটা না হয় অন্যদের দেখে ঠিক করে নিতে পারবে, কিন্তু ছুরি কাঁটা দিয়ে কেটে কেটে খেতে গেলে ওকে আধপেটা থাকতে হবে।

সুমনের বাবা এই বিড়ম্বনা থেকেও ছেলেদের রেহাই দিলেন। খাবার জন্য নিয়ে গেলেন বুফে কর্ণারে। বললেন, সবাই যে যার প্লেটে খাবার তুলে নাও। ইচ্ছে করলে হাতে খেতে পারো, ইচ্ছে করলে ছুরি কাঁটা দিয়ে। যা ইচ্ছে করবে প্লেটে তুলে নাও।

রবি আর ঝন্টু খেতে বসে টের পেলো এত উপাদেয় খাবার ওরা জীবনেও খায়নি।

পোলাও আর ভাত দুইই ছিলো। তিন ধরনের মাংশ, চার রকমের মাছ আর সবজি ছিলো দুই পদের। খাবার শেষে কাস্টার্ড, আর পুডিং দুটোই ছিলো। ওরা সবাই যে যার ইচ্ছে মতো খেলো। রবির বেশি

পছন্দ ছিলো চিংড়ির কালিয়া, আর ঝন্টু মজা করে খেলো কচি বাছুরের মাংশের স্টেক, এত নরম যে মুখে দিতেই মোমের মতো গলে যাচ্ছিলো।

বুফে রুমে চা সার্ভ করা হয় না। সুমনের বাবার দুপুরে খাওয়ার পর এক পেয়ালা সবুজ চা না হলে চলে না। চা খেতে ওদের তিনি নিয়ে গেলেন আধো অন্ধকার এক ঘরে। সারা ঘর অন্ধকার, শুধু টেবিলে হালকা আলোর আভাস। ঝন্টু ফিশ ফিশ করে রবির কানে কানে বললো, একেবারে ইংরেজি ছবির মতো লাগছে না?

রবি বললো, ছবি নয়, স্বপ্ন।

খেয়ে উঠে ওরা যখন হোটেলের বাইরে এলো বেলা তখন তিনটা। সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। ড্রাইভার রাজাকে সুমনের বাবা খাওয়ার জন্য আগেই টাকা দিয়েছিলেন। ও খেয়ে দেয়ে ড্রাইভিং সিটে বসে লেটেস্ট মাসুদ রানা পড়ছিলো। সুমন লক্ষ্য করেছে রাজা অবসর সময়টা বই না হলে খবরের কাগজ পড়ে কাটায়।

সুমনের বাবাকে আগ্রাবাদের এক অফিসে নামিয়ে দিয়ে ওরা রওনা হলো কক্সবাজারের পথে। রাজা আপন মনে বললো, কক্সবাজার যাইতে যাইতে রাইত হইয়া যাইবো।

সুমনদের গাড়িটা নাইন্টি টু মডেলের হোন্ডা সিভিক। বলতে গেলে একেবারেই নতুন। রবি, ঝন্টু আর সুমন বসেছিলো পেছনের সিটে। সুমনের বাবা নেমে যাওয়াতে রাজার পাশের সিটটা খালি পড়ে আছে।

সুমন কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে চোখ বুজে ওয়াকম্যানে ম্যাডোনার গান শুনছিলো। ঝন্টু আর রবির বহু দিনের জমে থাকা কথায় ওর কোনও আগ্রহ ছিলো না। সুমন ওদের কথা শুনছে না দেখে রবি আর ঝন্টু বলাবলি করছিলো কথা না বলার এক মাস ওরা কী কষ্টে কাটিয়েছে। রবি বলছিলো, কী যে বিচ্ছিরি লাগতো বিমলের সঙ্গে বাড়ি ফিরতে!

ঝন্টু অভিমান ভরা গলায় বললো, আমার বুঝি খুব ভালো লাগতো সন্ধ্যে বেলা একা একা বাড়ি ফিরতে? ভালো শিক্ষা হয়েছে। আর কখনও এরকম হবে না।

গত বছরও তো বলেছিলাম, আর এরকম হবে না।

আমার কী মনে হয় জানিস?

কী মনে হয়?

তুই যে আমার কত আপন এটা বুঝতে পারি তোর সঙ্গে ঝগড়া করে কথা বন্ধ করলে।

আমারও তাই মনে হয়।

রবি আর ঝন্টু কক্সবাজারের পুরোটা রাস্তাই এভাবে কথা বলে কাটিয়ে দিতে পারতো। সুমনও কানে ইয়ার ফোন লাগিয়ে ম্যাডোনার গানে বুঁদ হয়ে থাকতে পারতো। যাত্রায় বাধা পড়লো চট্টগ্রাম ছাড়ার এক ঘন্টা পর।

দু পাশে কোথাও ফাঁকা কোথাও ঘন জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের ভেতর দিয়ে রাস্তা চলে গেছে দক্ষিণে সমুদ্রের শহর কক্সবাজারের দিকে। শেষ বিকেলের মায়াবি রোদ পাহাড় আর জঙ্গলের গাছের মাথায় এলিয়ে পড়েছিলো। এমন সময় সুমন বললো, রাজা ভাই, সামনে একটা লোক লিফট চাইছে।

একটা উঁচু শাল গাছের নিচে লুঙ্গি পরা, চাদর গায়ে বগলে কাপড়ের পুটলি এক লোক লিফট নেয়ার জন্য হাত তুলেছে–এটা রাজারও চোখে পড়েছিলো। ও ভেবেছিলো সাড়া না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। গাড়ির স্পীড কমিয়ে সুমনকে বললো, জানি না, শুনি না–একজনরে গাড়িতে তোলা কি ঠিক হইবো?

এই রাস্তায় বিপদে না পড়লে কেউ লিফট চাইবে না। তাছাড়া বেশভূষা গ্রামের হলেও মনে হয় শহরের লোক। গ্রামের লোককে আমি কখনও লিফট চাইতে দেখি নি।

লোকটার পাশে রাজা গাড়ি দাঁড় করাতেই ও এগিয়ে এলো। বয়স খুব বেশি হলে তেইশ চব্বিশ হবে। গায়ের রঙ এক সময় ফর্শা ছিলো, রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। এক মাথা ঝাকড়া চুল, ধারালো অথচ মার্জিত চেহারা, চোখে চশমা, দেখেই মনে হয় কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া ছেলে।

লোকটা ভেবেছিলো, গাড়ির পেছনের সিটে বোধহয় মালিক বসে আছে কাছে এসে একটু অস্বস্তিতে পড়লো। রাজার চেহারা আসলে রাজপুত্রের মতো। তবে ওর পাশের সিট খালি দেখে লোকটার মনে হলো ও মালিক নয়। তবু ও রাজাকেই বললো, আপনারা কদুর যাবেন?

বিরক্তি মেশানো গলায় রাজা আলী এক শব্দে জবাব দিলো–কক্সবাজার।

দেখুন, আমি খুব অসুবিধেয় পড়েছি। লোকটাকে বিব্রত মনে হলো–সঙ্গে টাকা পয়সা কিছুই নেই। আজ রাতের ভেতরই আমাকে কক্সবাজার পৌঁছতে হবে। যদি দয়া করে লিফট দেন–

রাজা মাথা ঘুরিয়ে সুমনের দিকে তাকালো। সুমন লোকটাকে সামনের সিট দেখিয়ে বললো, উঠে পড়ুন।

অনেক ধন্যবাদ। বলে কৃতজ্ঞতার এক টুকরো হাসি ওদের উপহার দিয়ে লোকটা রাজার পাশের সিটে গিয়ে বসলো। রাজা আলী গাড়িতে স্টার্ট দিলো।

লোকটাকে দেখে ঝন্টুরও খুব মায়া লেগেছিলো। শক্ত সমর্থ শরীর হলেও ক্লান্ত চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিলো সারাদিন ওর কিছু খাওয়া হয়নি। পথে খাওয়ার জন্য সুমনের বাবা কমলা আর কলা কিনেছিলেন দাউদকান্দি ঘাট থেকে। ঝন্টুর একবার ইচ্ছে হলো লোকটাকে জিজ্ঞেস করে–কিছু খাবে কি না, পরে মনে হলো সুমন এটাকে আদিখ্যেতা ভাবতে পারে। অচেনা একজন লোক গাড়িতে ওঠাতে রবির সঙ্গেও আগের মতো কথা বলতে পারছিলো না ঝন্টু।

লোকটাকে দেখার পরই সুমনের গান শোনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। রহস্য লহরী সিরিজের বই পড়া ওর অনুসন্ধিৎসু মন বলছিলো লোকটা খুব সাধারণ একজন যাত্রী নয়। কিছুক্ষণ পর ও লোকটাকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করলো, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

লোকটা গাড়িতে ওঠার সময়ই টের পেয়েছিলো রাজা নিছক ড্রাইভার, গাড়ির মালিক আপাতত সুমন। বয়সে ওর চেয়ে ছ সাত বছরের ছোট হবে। মাত্র গোঁফের রেখা গজিয়েছে–তুমি বলবে না আপনি বলবে ঠিক করতে না পেরে বললো, কী কথা?

আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি এখানকার লোক নন। আপনার বাড়ি কোথায় জানতে পারি?

লোকটার ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান হাসি ফুটে উঠলো–বাড়ি কোথায় জানাটা কি খুব জরুরী?

জানা উচিৎ। গম্ভীর গলায় সুমন বললো, আপনাকে যখন লিফট দিচ্ছি আপনার পরিচয় জানা দরকার। আমাকে যদি সন্দেহজনক বা বিপদজনক মনে হয় আমি তো মিথ্যে পরিচয়ও দিতে পারি।

আমি মনে করি আপনি তা করবেন না।

ঝন্টু বললো, ওঁর যদি পরিচয় দিতে আপত্তি থাকে, তুই জোর করছিস কেন সুমন?

লোকটা একটু ইতস্তত করে বললো, না, আপত্তি কিসের! আমার বাড়ি ঢাকা। আর কিছু জানার আছে?

সুমন বললো, আপনার নাম বলেননি। কী করেন এটাও জানা দরকার।

লোকটার কথা বলার ভেতর বেশ একটা ব্যক্তিত্বপূর্ণ ভাব ছিলো। আধ ময়লা চাদর আর লুঙ্গি পরা হলেও গলার স্বর, উচ্চারণ খুবই মার্জিত আর পরিষ্কার। শান্ত গলায় লোকটা বললো, আমার নাম শোয়েব আহমেদ। চিটাগাং ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্সে মাস্টার্স পড়ছি।

সুমন আবার প্রশ্ন করলো, আপনি কি কোনও বিপদে পড়েছেন?

শোয়েব মৃদু হেসে প্রসঙ্গটা পাল্টাতে চাইলো–কারও পরিচয় জানতে হলে নিজের পরিচয়ও দিতে হয়।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে সুমন বললো, সরি, আমার নাম সুমন। এরা আমার বন্ধু, ঝন্টু আর রবি। রাজা আলী আমাদের ড্রাইভার হলেও আমার বন্ধুর মতো। আমরা এবার এস এস সি পরীক্ষা দিয়েছি। কক্সবাজার যাচ্ছি বেড়াতে।

সাবজেক্ট কী, সায়েন্স না আর্টস?

আমরা তিনজনই সায়েন্সের ছাত্র।

পরীক্ষা কেমন হয়েছে?

মন্দ নয়। আমার স্টার না থাকলেও সেভেন্টি পারসেন্টের ওপরে থাকবে। ঝন্টু স্টার পেতে পারে।

ঝন্টু বললো, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে সারাদিন কিছু খাননি। আমাদের সঙ্গে কলা আর কমলা আছে, খাবেন?

বেশি থাকলে খেতে পারি।

ঝন্টু দুটো কলা আর এটা কমলা এগিয়ে দিলো। শোয়েব একটু ইতস্তত করে বললো, খাবার পানি আছে?

চার বোতল মিনারেল ওয়াটার কেনা হয়েছিলো পথে। মাত্র এক বোতল শেষ হয়েছে। সুমন পানির বোতল বের করে শোয়েবকে দিলো।

ঢক ঢক করে বোতলের অর্ধেক পানি গলায় ঢেলে লাজুক হেসে শোয়েব বললো, ভীষণ তৃষ্ণা পেয়েছিলো।

সুমন লক্ষ্য করলো শোয়েবের হাসি খুবই নিষ্পাপ। ওর জড়তা কাটাবার জন্য বললো, আপনাকে আমরা যদি শোয়েব ভাই বলি আপনি আপত্তি করবেন?

করবো। শোয়েবের মুখে আগের মতো নিষ্পাপ হাসি। ওর মনে হলো এই ছেলেগুলোকে বিশ্বাস করলে ও ঠকবে না।

ওরা তিনজন একটু অবাক হলো শোয়েবের কথা শুনে। একটু দমেও গেলো। শোয়েব হেসে বললো, ভাই বললে কি আপনি বলার দরকার হয়?

এবার ওদের তিন জনের মুখে হাসি ফুটলো। ঝন্টু বললো, আপনিও কিন্তু কথা বলার সময় এড়িয়ে যাচ্ছেন। আমরা আপনার অনেক নিচে পড়ি। আমাদের তবু তুমি বলছেন না। ভাববাচ্যে কথা বলছেন।

অনুমতি পেলে বলা যায়।

নিশ্চয় তুমি বলবেন শোয়েব ভাই।

সুমন আর রবিরও কি একই মত?

হ্যাঁ শোয়েব ভাই। সুমন আর রবি শব্দ করে হাসলো। ঝন্টু বললো, সুমন তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিলো শোয়েব ভাই।

কোন কথা?

তুমি কি কোনও বিপদে পড়েছো?

এ কথা কেন মনে হচ্ছে?

সুমন বললো, তুমি চিটাগাং ইউনিভার্সিটিতে পড়ো, হাইওয়ের মাঝখানে এলে কোত্থেকে? তার ওপর বলছো টাকা পয়সা নেই, আজই কক্সবাজার পৌঁছতে হবে?

শোয়েব এবার শব্দ করে হাসলো–মনে হচ্ছে তোমরা রহস্য আর গোয়েন্দা গল্পের বই পড়তে খুব পছন্দ করো।

তা করি। তুমি কিন্তু প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না।

আমার টাকা পয়সা যদি ডাকাতরা নিয়ে যায় এটাও কম বিপদের কথা নয়।

তুমি সত্যি কথা বলছে না শোয়েব ভাই। সুমন বললো, ঢাকার যে ছেলে চিটাগং ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স পড়ে, সে কখনও লুঙ্গি পরে কক্সবাজার যাবে না। তার কাপড় চোপড়ও এরকম আধময়লা আর আন ইম্প্রেসিব হবে না।

তুমি ভালো ডিটেকটিভ হতে পারবে। আমি সত্যি–

শোয়েবের কথার মাঝখানে রাজা আলী বললো, সামনে পাঁচ ছয়টা লোক গাড়ি থামাইতে বইলতেছে।

শোয়েবের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ওরা সামনের রাস্তার দিকে লক্ষ্য করেনি। প্রায় একশ গজ দূরে ছয় জন লোক বেশ উদ্ধত ভঙ্গিতে গাড়ি থামানোর জন্য ইশারা করছে। দুজনের হাতে লাঠি। আরেকজনের চাঁদরের ভেতর কী আছে আল্লা মালুম, খুবই সতর্ক আর বেপরোয়া মনে হচ্ছে।

লোকগুলোর ওপর নজর পড়তেই শোয়েব উত্তেজিত গলায় বললো, গাড়ি থামাবেন না, রাজা ভাই। ফুল স্পীডে বেরিয়ে যান।

রাজা আলী গাড়ির স্পীড কমিয়েছিলো। হাত ভোলা লোকগুলো ভেবেছে গাড়ি বুঝি থামানো হচ্ছে। ওদের সতর্কতায় একটু ঢিল পড়তেই রাজা আলী পুশ করে ওদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলো। ঝন্টু শোয়েবকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি এদের চেনো?

হ্যাঁ চিনি। তিক্ত গলায় শোয়েব বললো, ওরা আমাকে পেলে নির্ঘাত খুন করবে।

কী বলছো তুমি শোয়েব ভাই? হ্যাঁ ঝন্টু। শান্ত গলায় শোয়েব বললো, তোমরা ঠিকই অনুমান করেছে। আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি।

৩-৪. চট্টগ্রাম কক্সবাজার হাইওয়ে

চট্টগ্রাম কক্সবাজার হাইওয়েতে গত দু মাস পাঁচটা বাস ডাকাতি হওয়াতে বিকেলের দিকে রাস্তা এক রকম ফাঁকা থাকে। শেষ বাস ছাড়ে একটায়, যাতে সন্ধ্যের আগে গন্তব্যে পৌঁছানো যায়। ঝন্টুরা লক্ষ্য করেছে পনেরো কুড়ি মিনিট পর পর দু একটা গাড়ি যতটা জোরে চালানো সম্ভব–পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। শোয়েবের কথা শুনে ওরা তিনজন হতবাক হয়ে গেলো। স্টিয়ারিঙে হাত রেখে রাজা আলী সতর্ক দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকলেও কান খাড়া করে ও সমবয়সী শোয়েবের কথা শুনছিলো। প্রথমে রাজা আলী কিছুটা বিরক্ত হলেও শোয়েবের সঙ্গে সুমনদের কথা শুনতে শুনতে বিরক্তি কেটে গিয়ে কখন যে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে টেরও পায়নি। ওর বিপদের কথা শুনে রাজা আলীও উদ্বেগ বোধ করলো।

শেষ বিকেলের আলো মরে গিয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। জঙ্গলের মাঝে মাঝে হাইওয়ের পাশে ফাঁকা জমিতে কুয়াশা জমতে শুরু করেছে। বসন্তকাল শেষ হতে চলেছে, তারপরও বাইরে তখন সমুদ্র থেকে উঠে আসা ঠাণ্ডা বাতাস বইছিলো। রাজা আলী গাড়ির হেড লাইট অন করেছে। ও জানে কুয়াশা জমা হাইওয়েতে গাড়ি খুব সাবধানে চালাতে হয়।

বিপদের কথা বলেই শোয়েব চুপ হয়ে গিয়েছিল। ও বুঝতে পেরেছে সুমনরা আন্তরিকভাবে ওর বিপদ সম্পর্কে জানতে চাইছে। তারপরও সদ্য স্কুলের পাঠ শেষ করা তিনটা নিষ্পাপ ছেলেকে ওর বিপদের কথা বলে ওদের উদ্বিগ্ন করার ব্যাপারে শোয়েব মন থেকে সায় পাচ্ছিলো না। সুমনরা কক্সবাজারে যাচ্ছে ছুটি কাটাতে, আনন্দ করতে। এ সময় ওদের আনন্দের জগৎ থেকে সরিয়ে আনা মোটেই উচিৎ হবে না। বিশেষ করে সব কথা শোনার পর ওরা যদিও কোনও ভাবে বিপদের সঙ্গে জড়িয়ে যায়, সেটা খুবই অনুচিৎ কাজ হবে।

শোয়েবকে চুপ থাকতে দেখে সুমনদের প্রথমে মনে হয়েছিলো কথাটা কিভাবে বলবে ভেবে দেখার জন্য ও বুঝি সময় নিচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পরও শোয়েব যখন কিছুই বললো না–সুমন

কিছুটা আহত বোধ করলো। গম্ভীর গলায় বললো, শোয়েব ভাই, তুমি কি আমাদের বিশ্বাস করতে পারছো না?

শোয়েব একটু চমকে উঠে পেছনে তাকালো–এ কথা কেন বলছো সুমন?

তুমি বিপদে পড়ছে, অথচ আমাদের জানাতে চাও না কী সেই বিপদ।

তোমরা কক্সবাজার যাচ্ছে বেড়াতে। এতদিনের পড়ার চাপ, টেনশন এসব ভুলে গিয়ে আনন্দ করবে তোমরা। আমার বিপদের কথা বলে তোমাদের আনন্দ নষ্ট করতে চাই না।

ঝন্টু বললো, শোয়েব ভাই, বিপদকে আমরা কেউই ভয় পাই না। সুমন আর আমি স্কাউটিং করি। যে কোনও বিপদকে আমরা চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখি। এই চ্যালেঞ্জ ফেস করার ভেতরও এক ধরনের আনন্দ আছে। আমাদের স্কাউট টিচার বলেন, প্রতি মুহূর্তের চ্যালেঞ্জের ভেতরই লুকিয়ে থাকে বেঁচে থাকার আনন্দ।

শোয়েব ম্লান হেসে বললো, স্কুলে থাকতে স্কাউটিং আমিও করতাম ঝন্টু। স্কাউটিং-এর আনন্দ হচ্ছে এ্যাডভেঞ্চারের, আর আমার বিপদ হচ্ছে মৃত্যু আমাকে তাড়া করছে।

রবি জানতে চাইলো, তুমি কোন স্কুলে পড়তে শোয়েব ভাই?

সেন্ট গ্রেগরিতে। নিকোলাস স্যার ছিলেন আমাদের স্কাউট টিচার।

কী বললে? তুমি গ্রেগরিয়ান? ওরা তিনজন উচ্ছ্বসিত গলায় বললো, শোয়েব ভাই, আমরাও সেন্ট গ্রেগরির ছাত্র।

শোয়েব হেসে বললো, ভালোই হলো, হঠাৎ পথে তিন গ্রেগরিয়ান বন্ধুর দেখা পেয়ে।

সুমন এবার শোয়েবকে পেয়ে বসলো, এইবার তোমাকে বলতেই হবে শোয়েব ভাই। একজন গ্রেগরিয়ান বিপদে পড়বে আর অন্যরা ওকে ফেলে চলে যাবে, এমন শিক্ষা আমাদের টিচাররা কখনও দেন নি।

ঝন্টু বললো, তোমার বিপদই যদি শেয়ার না করবে তাহলে অযথা বন্ধু বলছো কেন?

ঠিক আছে, বলছি। একটু থেমে শোয়েব বললো, আমাদের স্কুলের সমস্যা একটাই। রাজনীতির কোনও বিষয় স্কুলের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেয়া হয় না।

রবি বললো, স্কুলের ছেলেদের কি রাজনীতির ব্যাপারে নাক গলানো ভালো?

নাক গলানো ভালো না হলেও জানা উচিৎ। রাজনীতির ভালো দিক, খারাপ দিক দুটোই জানা উচিৎ।

সুমন অধৈর্য হয়ে বললো, স্কুল পেরিয়েছি এবার জেনে ফেলবো, তুমি তোমার কথা বলো।

আমার বিপদটা রাজনীতি থেকে আলাদা নয়, তোমরা ছাত্র শিবিরের কথা শুনেছো?

ঝন্টু জবাব দিলো–কেন শুনবো না। যারা ছাত্রদের হাত পায়ের রগ কাটে, খুন করে ওরাই তো শিবির। খবরের কাগজ খুললেই ওদের দৌরাত্মের কথা জানা যায়।

ঠিক বলেছো। চিটাগং ইউনিভার্সিটি হচ্ছে ওদের ঘাঁটি। যেদিন থেকে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি সেদিন থেকে ওদের দৌরাত্ম চোখের সামনে দেখছি। যারা ওদের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদের ওপর ওরা কী ভয়াবহ অত্যাচার চালায় চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। ইউনিভার্সিটির মেয়েদের, এমন কি ম্যাডামদের ওপরও ওরা কম অত্যাচার করেনি।

রবি বললো, ইউনিভার্সিটি অথরিটি কী করে? ওদের বের করে দিতে পারে না?

পারলে তো করবে! ইউনিভার্সিটির চারপাশের গ্রামগুলোতে ওদের পার্টি জামাতে ইসলামীর শয়তানরা রীতিমতো ঘাটি বানিয়ে বসে আছে। অথরিটি ওদের ভয় পায়। টিচারদের মধ্যে ওদের সাপোর্টারও কম নয়। এদিকে ছাত্রদল আর ছাত্রলীগের মারামারি তো আছেই। এই সুযোগে শিবিরের গুণ্ডারা ছাত্রলীগ আর ছাত্রদল দুটোকেই মারছে।

তুমি কোন দল করো? জানতে চাইলো ঝন্টু।

আমি ছাত্র ইউনিয়ন করি। যেদিন শিবিরের শয়তানরা হামিদা ম্যাডামের গায়ে হাত তুললো সেদিনই ঠিক করলাম, এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। কলেজে থাকতেই ঠিক করেছিলাম যদি ছাত্র রাজনীতি করি তাহলে এমন সংগঠন করবো যারা সমাজতন্ত্রের জন্য কাজ করে। ছাত্র ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে ভালো লাগলো। জানেনা তো, যারা সমাজতন্ত্রের জন্য কাজ করে ওদের বামপন্থী বলে। বামপন্থীদের ভেতরও অনেক ভাগ। আমি আর আমার কয়েকজন বন্ধু মিলে ঠিক করলাম বামপন্থীদের আগে জোট বাঁধতে হবে। তারপর ছাত্রলীগ, ছাত্রদল সবাইকে এক করে শিবিরের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। আমি যখন থার্ড ইয়ারে পড়ি, তখনই শিবির আমাকে টার্গেট করেছে।

বাইরে কখন যে রাত নেমেছে সুমনরা টের পায়নি। রাজা আলী হঠাৎ জোরে ব্রেক করাতে সবাই চমকে উঠলো। শোয়েব উত্তেজিত গলায় জানতে চাইলো, কী হয়েছে?

রাজা আলী বিড় বিড় করে একটা গালি দিয়ে বললো, গাড়ির সামনে শিয়াল পইড়ছিলো।

গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। সুমনরা বাইরে তাকিয়ে দেখলো চারপাশে অন্ধকারের কালো পর্দা ঝুলছে। রাজা আলী বেশ কয়েকবার স্টার্ট নেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো।

ঝন্টু শোয়েবকে বললো, কই শোয়েব ভাই, তোমার আসল বিপদের কথা বলো।

শোয়েব উদ্বিগ্ন গলায় বললো, দাঁড়াও, গাড়ি আবার বিগড়ালো নাকি?

গাড়ির কিছু হয় নাই। বলে রাজা আলী ইঞ্জিন পরীক্ষা করার জন্য টর্চ হাতে ইঞ্জিন দেখার জন্য গাড়ি থেকে নিচে নামলো।

সুমনও শোয়েবকে তাড়া দিলো, বলল শোয়েব ভাই।

এভাবে গাড়ি থেমে যাওয়া শোয়েবের ভালো লাগছিলো না। তবু সুমনদের কৌতূহল মেটাবার জন্য বললো, মাস ছয়েক হলো আমরা জামাত-শিবিরের বিরুদ্ধে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য করেছি। গত মাসে শিবিরের গুণ্ডাদের মেরে হল থেকে বের করে দিয়েছিলাম।

একজনের ঘর থেকে আমার রুমমেট রকিব শিবিরের গোপন কিছু কাগজপত্র উদ্ধার করেছে। কিভাবে ওরা ক্যাম্পাসের চারপাশে ঘাঁটি গেড়েছে, কোথায় কী অস্ত্র আছে, অস্ত্রের সাপ্লাই কোত্থেকে আসে এরকম অনেক নোট ছিলো। সাত দিন পরই শিবির পাল্টা হামলা করে। গ্রাম থেকে জামাতীরা মেশিন গান নিয়ে এসেছিলো। রকিব ছাত্রলীগ করতো। শিবিরের গুণ্ডারা ওকে ধরে নিয়ে যায়। দুদিন পর ক্যাম্পাসের গেটের কাছে ওর ডেড বডি পাওয়া গেছে। মারার আগে প্রচণ্ড অত্যাচার করেছিলো ওর ওপর।

রকিবের কথা বলতে গিয়ে শোয়েবের গলা ধরে এসেছিলো। সুমন, ঝন্টু আর রবির ভীষণ রাগ হলো শিবিরের গুণ্ডাদের ওপর। জানালার কাঁচ নামিয়ে শোয়েব পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলো। গাড়িতে ওঠার পর ও সিগারেট খায়নি। জানে, অনেকে গাড়ির ভেতর সিগারেট খাওয়া পছন্দ করে না। রকিবের কথা মনে পড়াতে ওর বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠলো। সিগারেট ধরাবার জন্য ও যখন লাইটার জ্বালালো, ঝন্টু দেখলো ওর চোখের কোণে পানি জমেছে।

সুমন বললো, তোমার বন্ধু যে কাগজগুলো উদ্ধার করেছিলো সেগুলো কি তোমার কাছে?

শোয়েব আনমনে মাথা নেড়ে সায় জানালো।

সেজন্যেই ওরা তোমাকে মারতে চাইছে।

হ্যাঁ, পরশু রাতে ওরা আমার রুমে হামলা করেছিলো। আমি তখন অন্য রুমে ছিলাম বলে এখনও বেঁচে আছি।

তুমি ঢাকা না গিয়ে কক্সবাজার যাচ্ছো কেন?

ওরা জানে আমি ঢাকা যাবো। ইউনিভার্সিটি থেকে শহরে যাওয়ার পথে ওরা শয়ে শয়ে পাহারাদার বসিয়েছে। প্রত্যেকটা বাস আর ট্রেন ওরা সার্চ করছে। কক্সবাজার আমাদের সংগঠনের এক নেতা থাকেন। ক্যাম্পাসে বন্ধুরা সবাই বললো, কিছুদিন ওখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে।

কাগজগুলো কী করবে?

জামাতের বিরুদ্ধে যারা লেখে এমন কোনও সাংবাদিককে দেবো। এগুলো পত্রিকায় বেরুলে জামাত শিবিরের আসল চেহারা সবার কাছে ধরা পড়ে যাবে।

ঝন্টু বললো, কাগজগুলো কি এখন তোমার সঙ্গে আছে?

হ্যাঁ। কাপড়ের পোটলাটা দেখিয়ে শোয়েব বললো, এর ভেতর দুটো ডায়রী, তিনটা খাতা আর দুটো ফাইল আছে।

খাতা কিসের?

ওদের যে সাপ্তাহিক বৈঠক হয় তার পুরো বিবরণও লেখা আছে ওতে। কে কখন কাকে কোথায় খুন করেছে, কার কার হাত পায়ের রগ কেটেছে, ভবিষ্যতে কাদের খুন করা হবে সব ওতে রিপোর্ট করা আছে।

পথে যারা গাড়ি থামাতে চেয়েছিলো ওরা কি শিবিরের লোক?

হ্যাঁ, একটাকে ক্যাম্পাসে দেখেছি। ওদের হয়ে মারপিট করার সময় আসে।

সুমন একটু চিন্তিত গলায় বললো, ওরা তো জেনে গেলো তুমি কক্সবাজার যাচ্ছে। হামলা তো সেখানেও হতে পারে।

হতে পারে। তবে পথে হলেই বিপদ। এই বলে শোয়েব সামনে ইঞ্জিনের দিকে তাকালো– গাড়িটা এমন জায়গায় বিগড়ালো–

বনেট তুলে রাজা আলী ইঞ্জিন পরীক্ষা করছিলো। সুমন গাড়ি থেকে নেমে ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, গণ্ডগোল কোথায় ধরতে পেরেছে রাজা ভাই?

ইঞ্জিনের ওপর থেকে মাথা তুলে বললো, বুঝতে পাইরতেছি না। মনে হইতেছে কার্বুরেটরে ময়লা জইমছে। ব্যাটারিও ডাউন হইতে পারে।

সুমন চিন্তিত গলায় জানতে চাইলো, কক্সবাজার এখান থেকে কত দূর।

পনেরো মাইলের কম। একটু আগে আমি মাইল পোস্ট দেখছি।

পনেরো মাইল হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে কোনও গাড়ি-টাড়ি যদি পাওয়া যায়, রাজা ভাই গিয়ে মেকানিক আনতে পারবে।

ঝন্টু আর রবি পথে দেরি হওয়ার জন্য খুব একটা চিন্তিত ছিলো না। জঙ্গলের ভেতর রাতের অন্ধকারে হাইওয়েতে গাড়ি খারাপ হওয়া, পনেরো মাইলের ভেতর কোনও লোকালয় না থাকা–বেশ একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা মনে হচ্ছিলো ঝন্টুর। শোয়েবের অবস্থা ওদের মতো নয়। গাড়ি থাকাতে একবার ওদের হাত থেকে বাঁচা গেছে। যদি টের পায় ওঁরা সময় মতো কক্সবাজার পৌঁছোয় নি তাহলে ঠিকই বুঝে ফেলবে পথে গাড়ি খারাপ হয়েছে। কক্সবাজার থেকে এ পর্যন্ত আসতে মিনিট পনেরো লাগতে পারে। ও একা না হলেও কারও কাছেই অস্ত্র নেই। ওরা আসবে পুরোপুরি সশস্ত্র হয়ে। ওদের কাগজপত্র তো ছিনিয়ে নেবেই সাক্ষী হিসেবে কাউকেই বাঁচিয়ে রাখবে না।

কাগজগুলো কিভাবে ওদের হাত থেকে রক্ষা করা যায় ভাবতে গিয়ে শোয়েব সুমনের শরণাপন্ন হলো। ওকে ডেকে বললো, আমার সঙ্গে যে কাগজগুলো আছে সেগুলো গাড়ির ভেতর কোথাও লুকিয়ে রাখা যাবে?

সুমন একটু ভেবে বললো, পেছনে বুটের ভেতর রাবার শিটের তলায় রাখা যায়।

শোয়েব ওর পোটলা খুলে কাগজগুলো বের করলো। কাগজপত্র ছাড়াও পোটলার ভেতর ওর জামা কাপড় ছিলো। পেছনের বুট খুলে রাজা আলী বাড়তি চাকা, জ্যাক, খালি জেরি ক্যান, টুল বক্স সব নামিয়ে রাখলো। রাবার শিট তুলে খাতা, ডায়রি, ফাইল সব এমন ভাবে বিছিয়ে রাখলো যাতে ওপর থেকে বোঝা না যায়। শিটটা জায়গা মতো বিছিয়ে ওপরের জিনিসপত্র আবার আগের মতো রেখে দিলো। তারপর ও শোয়েবকে বললো, এইবার আর কেউ বুইঝতে পাইরবে না নিচে যে কিছু রাইখছি।

শোয়েবও মাথা নেড়ে ওকে সমর্থন জানালো।

ঝন্টু বললো, আমরা কি কক্সবাজারের পথে হাঁটবো, না এখানে গাড়ি আসার জন্য অপেক্ষা করবো?

শোয়েব বললো, এখানে অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। এই রাতে গুণ্ডাদের গাড়িই আমরা আশা করতে পারি, কোনও ভালো মানুষ গাড়ি বের করবে না।

রাজা আলী বললো, শোয়েব ভাই ঠিক কথা কইছেন। আমি গত এক ঘণ্টা কোনও গাড়ি কিংবা মানুষজন কিছু দেখি নাই।

জঙ্গলের ভেতর অন্ধকার রাস্তায় পনেরো মাইল হাঁটার প্রস্তাব রবির মোটেই ভালো লাগলো না। ঝন্টু আর সুমন সারাক্ষণ এ্যাডভেঞ্চার আর ডিটেকটিভ বই পড়ে সব কিছুতে রহস্য খুঁজে বেড়ায়। এই

জঙ্গলে বাঘ না থাকলেও বুনো হাতি থাকতে পারে, অন্য কোনও হিংস্র জানোয়ার থাকতে পারে। তাছাড়া পুরোনো বনে অনেক খারাপ জিনিস থাকতে পারে রাতে যাদের নাম নিতে নেই। রবি শুকনো গলায় বললো, শোয়েব ভাই এত সব দরকারী কাগজপত্র ফেলে কি আমাদের সবার যাওয়া ঠিক হবে? ভালো হয় রাজা ভাই গিয়ে যদি একটা মেকানিক আনতে পারে।

ঝন্টু বুঝতে পেরেছিলো শোয়েব অচল গাড়িতে বসে থাকার ঝুঁকি নিতে চাইছে না। রাস্তায় থাকলে কেউ হামলা করতে এলে সামাল দিতে না পারলে দৌড়ে পালাবার সুযোগ থাকবে। গাড়ির ভেতর বসে থাকলে ফাঁদে আটকা পড়া ইঁদুরের মতো মরতে হবে। ও বললো, না রে রবি। একা রাজা ভাইর এতটা পথ যাওয়া ঠিক হবে না। শোয়েব ভাইর কাগজপত্র যেখানে আছে সেটাই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। ওরা খুঁজবে শোয়েব ভাইকে এখানে বসে থাকার চেয়ে চল কক্সবাজারের পথে হাঁটি। পথে যদি কোনও গ্রাম কিংবা বাজার চোখে পড়ে সেখানেও আশ্রয় নিতে পারি। অচল গাড়িতে সারারাত বসে থাকা উচিৎ হবে না।

সুমন বললো, গ্রাম নিশ্চয় পথে পড়বে। ঝন্টু ঠিক বলেছিস। গ্রামে গিয়ে কারও বাড়িতে উঠে সেখানকার কোন লোককে রাজা ভাইর সঙ্গে কক্সবাজার পাঠাতে পারি। খোঁজ করলে গ্রামে সাইকেল পাওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়।

গ্রামে থাকার প্ল্যানটা রবির খারাপ লাগলো না। যে যার ব্যাগ কাঁধে নিয়ে তৈরি হলো। দলের সঙ্গে বেমানান মনে হবে দেখে শোয়েব লুঙ্গি চাদর বদলে প্যান্ট শার্ট পরে, নিলো। কলা আর কমলা সব আগেই খাওয়া শেষ। শুধু মিনারেল ওয়াটারের বোতল দুটো ঝন্টু আর রবি ওদের ব্যাগে ভরে নিলো। ফাইলপত্র বের করে ফেলাতে শোয়েবের পোটলাটা ছোট হয়ে গিয়েছিলো। সুমন ওকে বললো, তোমার কাপড় চোপড় আমার ব্যাগে দাও শোয়েব ভাই। প্যান্ট শার্ট পরা তোমার মতো স্মার্ট কেউ বগলে কাপড়ের পোটলা নিয়ে হাঁটে না।

মৃদু হেসে শোয়েব বললো, তোমার বিচার ক্ষমতার প্রশংসা না করে পারছি না। তবে তোমার ব্যাগে জায়গা নিতে পারি এক শর্তে।

কী শর্ত? একটু অবাক হয়ে জানতে চাইলে সুমন।

তোমার ব্যাগ আমার কাঁধে থাকবে।

ঠিক আছে শোয়েব ভাই। হাসি চেপে গম্ভীর হওয়ার ভান করে সুমন বললো, তোমার শর্ত মঞ্জুর করা হলো।

সুমনের কথার ধরণ দেখে ঝন্টু হেসে ফেললো। গত বছর ক্যাম্পিং-এ গিয়ে ওরা বাদশার বিচার নাটক করেছিলো। সুমন করেছে বাদশার পার্ট। সবাই খুব প্রশংসা করায় সুমন সুযোগ পেলে সেই নাটকের ঢংয়ে কথা বলে। ঝন্টু ওকে বললো, আমারও যে একটা আর্জি ছিলো জাঁহাপনা।

পেশ করো বাদশার ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে বললো সুমন।

আমার ব্যাগটা একটু বেশি ভারি। মাঝে মাঝে আমি জঁহাপনাকে তকলিফ দেবো ব্যাগটা বইবার জন্য।

তোমার গোস্তাখি দেখে আমি অবাক হচ্ছি বান্দা। কোন সাহসে তুমি আমাকে বোঝা বইতে বলো?

নইলে জাহাপনা, আপনার দুই বান্দা আপনাকে এই জঙ্গলে ফেলে একটা রাম খোলাই দেবে।

ঠিক আছে বান্দা। তোমার আর্জি এখন মঞ্জুর করা হলো,কাল দরবারে বসে তোমার বেয়াদবির বিচার করা হবে।

ফুর্তিভরা মনে ওরা টর্চের আলোয় হাঁটছিলো হাইওয়ে ধরে। তখন কেউ ঘুণাক্ষরে কল্পনাও করেনি সামনে কী ভয়ঙ্কর বিপদ ওদের জন্য ওঁৎ পেতে রয়েছে।

.

৪.

ঝন্টু ও সুমনের নাটকের পালা শেষ হওয়ার পর অন্ধকার জঙ্গলের ঝিঁঝি ডাকা নিরবতায় সবাই আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। কাছে, দূরে হাজার হাজার ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়া কোথাও কোনও শব্দ নেই। রবি বললো, কাউকে যদি সারারাত একা এ পথ দিয়ে হাঁটতে হয় সে নির্ঘাত পাগল হয়ে যাবে।

ঝন্টু বললো, আমাদের বাংলার ইদ্রিস স্যার শরশ্চন্দ্রের আঁধারের রূপ পড়াতে গিয়ে এটাই ব্যাখ্যা করতে বলেছিলেন।

এটা কোনটা? জানতে চাইলো সুমন।

শ্রীকান্ত পড়েছিস?

না পড়িনি।

তাহলে আর আঁধারের রূপ বুঝবি কিভাবে! স্কুলে থাকতে শ্রীকান্ত বাজি ধরে এক রাত শ্মশানে ছিলো। অন্ধকার রাতের এক অসাধারণ বর্ণনা আছে ওতে। এক জায়গায় আছে ঝিঁঝি পোকার শব্দ রাতের নিরবতাকে আরও বাড়াইয়া দিয়াছিল। এটাই ব্যাখ্যা করতে বলে, শব্দ কিভাবে নিরবতাকে বাড়িয়ে দেয়।

এখন বুঝেছি। জবাব দিলো সুমন।

শোয়েব বললো, তোমরা না স্কাউটিং কর?

হা করিই তো। জোর দিয়ে বললো ঝন্টু।

তাহলে কোরাসে গান ধরতে অসুবিধে কোথায়?

অসুবিধের কথা কেউ কি বলেছি?

সবাই মিলে তাহলে গান ধরো!

কোনটা গাইবো, গ্লোরি হালালুজা?

একটার পর একটা গাইতে থাকো না? যতক্ষণ স্টক আছে ততক্ষণ তো গাওয়া যায়। এই বলে শোয়েব ওর ভরাট গলায় গান ধরলো, এ্যাম উই গো মার্চিং অল।

ঝন্টু আর সুমনের সঙ্গে রবিও গলা মেলালো। স্কাউটিং না করলেও ওদের স্কুলের এসব গান শুনতে শুনতে ওরও মুখস্ত হয়ে গিয়েছিলো। কোরাসে গান গাইতে গিয়ে ঝন্টু টের পেলো শোয়েবের গলায় চমৎকার সুর আছে। গ্লোরি হালালুজার পর মাই ডার্লিং ক্লেমেন্টাইন গাওয়া শেষ করে ঝন্টু বললো, শোয়েব ভাই, তুমি লুকোতে পারবে না। তুমি নিশ্চয় গান গাও।

গান গাই, এটা লুকোচ্ছি কোথায়? হেসে জবাব দিলো শোয়েব, স্কুলে থাকতে টেলিভিশনের নতুন কুঁড়িতে একবার রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে ফার্স্ট হয়েছিলাম।

তাহলে একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাও।

সারাদিনের উদ্বেগ আর বিপদের সম্ভাবনা ভুলে থাকার জন্য ঝন্টুদের গান গাইবার জন্য বলেছিলো শোয়েব। তবে একা গান গাইবার মুড ওর ছিলো না। বললো, আমার সঙ্গে তোমাদেরও গাইতে হবে।

জানা গান হলে গাইবো। ঝন্টু বললো, তুমি কোনটা গাইতে চাও?

সবাই মিলে এমন পরিস্থিতিতে গাওয়ার জন্য আগুন জ্বালো মন্দ হবে না।

দারুণ হবে। বলে ঝন্টু এক লাইন বাদ দিয়ে শুরু করলো, একলা রাতের অন্ধকারে, আমি চাই পথের আলো।

সবাই এক সঙ্গে কোরাস ধরলো–আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো/ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে।

এরপর ওরা গাইলো আমি ভয় করবো না আর বাঁধ ভেঙ্গে দাও।

রাজা আলী হাঁটছিলো সবার আগে। ওর হাতে টর্চ। বাংলা গানগুলো ওর কাছে অচেনা মনে না হলেও সুমনদের সঙ্গে কোরাস গাইবার মতো সাহস ওর ছিলো না। ও হিসেব করছিলো এক ঘন্টায় ওরা তিন

মাইলের ওপর হেঁটেছে। ঘন জঙ্গল পেরিয়ে ওরা কিছুটা ফাঁকা জায়গায় এসেছে, তখনই রাজা আলী বললো, সামনে গ্যারাম দেখা যাইতেছে।

সম্ভবত দূর থেকে ওদের গান শুনে কুকুর ডাকছিলো। মানুষের চেয়ে কুকুরের শোনার ক্ষমতা অনেক বেশি। কুকুরের ডাক কানে আসতেই ওরা দেখলো দূরে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটা আলো দেখা যাচ্ছে। ওদের সবার মুখে হাসি ফুটলো।

হাইওয়ে থেকে সামান্য বায়ে নামতেই সামনে যে টিনের বাড়ি দেখা গেলো ওরা সেখানেই গিয়ে দাঁড়ালো। শোয়েব বললো, তোমরা নিশ্চয় চিটাগংয়ের আঞ্চলিক ভাষা জানো না। ওদের ভাষায় কথা বললে বেশি খাতির পাওয়া যাবে। এই বলে ও গলা তুলে ডাকলো, বাড়িতে কেউ আছেন?

দু বার ডাকতেই হারিকেন হাতে মাঝ বয়সী মুখে কালো দাড়িওয়ালা একজন বেরিয়ে এলো। দেখে মনে হয় গ্রামের অবস্থাপন্ন কৃষক জোতদারও হতে পারেন। হারিকেনের আলো ওদের মুখের কাছে ধরে বললো, তোমরা কারা?

দাড়ি দেখে প্রথমে শোয়েব লম্বা এক সালাম দিয়ে বললো, আমরা মুসাফির। শোয়েবের মুখে চট্টগ্রামের কথা শুনে কেউ বুঝতে পারবে না ওর বাড়ি যে এখানে নয়। ফার্স্ট ইয়ারে থাকতেও ওর স্থানীয় বন্ধুরা বুদ্ধি দিয়েছিলো রাস্তা ঘাটে রিকশা স্কুটারে কিংবা দোকানপাটে গিয়ে যদি ঠকতে না চায় তাহলে যেন চট্টগ্রামের ভাষা শিখে নেয়।

আমরা কক্সবাজার যাচ্ছিলাম। শোয়েব কাতর গলায় বললো, পথে গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। রাতে থাকার জন্য আপনাদের গ্রামে কি কোথাও জায়গা পাওয়া যাবে? বাড়িতে না হলে মসজিদেও থাকতে পারি।

আমার এত বড় বাড়ি। আমি থাকতে তোমরা অন্য কোথাও কেন থাকবে? এই বলে গৃহকর্তা গলা তুলে ডাকলেন, মকবুইল্লা, ওরে মকবুইল্লা!

বিশালদেহী কামলা গোছের এক লোক অন্ধকার কুঁড়ে সামনে এসে জ্বী হুজুর, বলে হাত কচলাতে লাগলো।

গৃহকর্তা বললেন, শিগগির কাঁচারি ঘর খুলে দে। এরা ঢাকার মেহমান। মোরগ জবাই দে। এদের মুখ হাত ধোয়ার সাবান পানি দে।

শোয়েব বিব্রত হয়ে বললো, অসময়ে রান্না বান্নার ঝামেলা কেন করবেন? আমাদের একটু গুড় মুড়ি পেলেই চলবে।

তা কি করে হয়? অপ্রসন্ন গলায় গৃহকর্তা বললেন, আপনারা এক রাতের মেহমান। আপনাদের উপযুক্ত মেহমানদারি করতে পারবো না। তারপরও আল্লার রহমতে আমার বাড়িতে দুই বেলা পাঁচ সাত জন বাড়তি মানুষের জন্য রান্না হয়। আপনারা মুড়ি খেয়ে রাত কাটালে গ্রামে আমি মুখ দেখাবো কি করে?

চট্টগ্রামের গ্রাম এলাকার মানুষের অতিথিপরায়ণতার কথা শোয়েবের অজানা নয়। এ নিয়ে আর কথা না বাড়িয়ে ও বললো, আমাদের একজনের আজ কক্সবাজার যাওয়া দরকার। ওখান থেকে মেকানিক আনতে হবে। আমাদের গাড়ি রাস্তার ধারে অচল হয়ে পড়ে আছে।

কোনও চিন্তা করবেন না। আপনারা মুখ হাত ধুয়ে খাওয়া দাওয়া করুন। অতিথিব সল গৃহকর্তা বললেন, আমার বড় ছেলের হোণ্ডা আছে। ও আপনাদের একজনকে কক্সবাজার নিয়ে যাবে। বেশি হলে মিনিট পনেরো লাগবে যেতে।

গৃহকর্তার কথা শেষ হলে নিচু গলায় মকবুল বললো, আপনারা আমার সঙ্গে আসেন।

গৃহকর্তা নিজের হাতের হারিকেন মকবুলকে দিয়ে ভেতরে গেলেন। শোয়েবরা মকবুলকে অনুসরণ করে সামনের কাঁচারি ঘরে এলো। দরজায় তালা লাগানো ছিলো। কোমরে বাঁধা চাবির গোছা থেকে চাবি বের করে ও দরজা খুললো।

ঘরের অর্ধেক জুড়ে পাশাপাশি দুটো বড় তক্তপোষ পাতা। ওপরে পাটি বিছানো একপাশে হাতলওয়ালা দুটো চেয়ার আর কাঠের আলমারি। মকবুল দরজার পাশে হারিকেন রেখে বললো, আপনারা বসেন। আমি আপনাদের বিছানা এনে দিচ্ছি।

তক্তপোষের ওপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো সুমন, ঝন্টু আর রবি। ঝন্টু বললো, তুমি যে এক অসম্ভব কাজ করে ফেললে শোয়েব ভাই। কোথায় রাস্তায় নয় গাড়িতে বসে খালি পেটে রাত কাটাতে হতো। আর এখানে একেবারে জমিদারী কায়দায় অতিথি আপ্যায়ন।

শোয়েব বললো, এমনিতে আমাদের দেশের গ্রামের মানুষ খুব অতিথিপরায়ণ হয়। তার ওপর গৃহকর্তা বেশ অবস্থাপন্ন মনে হচ্ছে। ছেলেকে হোণ্ডা কিনে দিয়েছে, কম কথা নয়।

সুমন বললো, তোমার নিজের বাহাদুরি স্বীকার করছে না শোয়েব ভাই। চিটাগং-এর ভাষায় কথা না বললে এত খাতির পেতে না।

শোয়েব কোনও কথা না বলে মৃদু হাসলো। দুজন লোকের মাথায় তোশোক বালিশ চাদর আর কম্বল চাপিয়ে মকবুল ঘরে ঢুকলো। ওর পেছনে একজন বাইরে উঠোনে বালতি ভরা পানি আর সাবান তোয়ালে এনে রেখে দাঁড়িয়ে রইলো।

সারাদিনে ধকল শোয়েবের ওপর দিয়েই বেশি গেছে। ভোর না হতে ও হাঁটা শুরু করেছিলো। গত রাতে ও রুমে ফেরেনি। লণ্ডিতে এক জোড়া প্যান্ট শার্ট ছিলো। রকিবের উদ্ধার করা কাগজগুলো আগেই সরিয়ে রেখেছিলো ইকবাল স্যারের কোয়ার্টারে। ওর রুমে হামলা হওয়ার পর থেকে ও রোজ রাতেই এক রুম থেকে। আরেক রুমে, এক হল থেকে অন্য হলে রাত কাটাচ্ছিলো। কাল রাতেই ওরা খবর পেয়েছে শিবিরের গুণ্ডারা একটা বড় ধরনের হামলা করবে। শুধু ওর সংগঠনের নয়, ছাত্র ফ্রন্ট আর ছাত্রলীগের বন্ধুরাও ওকে সতর্ক করে দিয়েছিলো, এবারের হামলায় প্রধান টার্গেট হচ্ছে শোয়েব। ক্যাম্পাসে যদিও পর্যাপ্ত পুলিশ বসানো হয়েছে, ইকবাল স্যারও ওকে বলেছিলেন, দরকার মনে করলে ওঁদের কোয়ার্টারে গিয়ে থাকতে। শোয়েবের বন্ধুরা কোনওটাই নিরাপদ মনে করেনি। সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শোয়েব শেষ রাতে গ্রামের ভেতর দিয়ে হেঁটে হাইওয়েতে উঠেছে। বাসে ওঠার মতো টাকা ওর সঙ্গে থাকলেও বাস নিরাপদ মনে হয়নি। লোকাল বাসে জামাত শিবিরের লোকেরা চলাফেরা করে। কেউ চিনে ফেলতে পারে। সেজন্য ও গাড়িতে লিফট নেয়ার প্ল্যান করেছিলো। সুমনদের গাড়ির আগে ও কম করে হলেও দেড় ডজন গাড়িতে লিফট চেয়েছিলো। ওর বেশভূষা দেখে কেউ পছন্দ করেনি।

ওরা সবাই মুখ হাত ধুয়ে বিছানায় শুয়ে বসে আলোচনা করছিলো। মেকানিক পাওয়া গেলেও রাতে নিশ্চয় ওদের যেতে দেয়া হবে না। সকালে রাজা আলী ওদের কক্সবাজার সার্কিট হাউসে নামিয়ে চট্টগ্রাম ফিরে যাবে, যদি গাড়িটা রাতে সারানো যায়।

রাত নটা না বাজতেই মকবুল এসে ঘরের মাটির মেঝেতে মাদুর পেতে নকশি কাঁথার দস্তরখানা বিছিয়ে দিলো। একজন ওটার ওপর বড় বড় ফুল আঁকা চিনেমাটির প্লেট রেখে গ্লাসে পানি ঢেলে সামনে রাখলো। দুজন লোক বড় ট্রেতে ভাত, ডাল, আলু ভাজি, ডিমের ঝোল আর মুরগির রেজালা আনলো। ওদের পেছন পেছন গৃহকর্তা আর তার ছেলে ঘরে ঢুকলো। সুমনদের চেয়ে বছর দুয়েকের বড় হবে, প্যান্ট শার্ট পরে তৈরি হয়ে এসেছে। ফর্শা গায়ের রঙ, এখনও শেভ করা শুরু করেনি, গালে পাতলা দাড়ির আস্তরণ, আরেকটু বড় হলে চে গুয়েভারার মতো লাগতো।

গৃহকর্তা বললেন, কই বাবারা, আপনারা আরম্ভ করেন। এ হচ্ছে আমার ছেলে সৈয়দ ফজলুল করিম, কক্সবাজার কলেজে পড়ে। এবার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেবে। খাওয়া সেরে উঠুন। ওর সঙ্গে আপনারা একজন কক্সবাজার যেতে পারেন।

ওদের সবারই ক্ষিদে পেয়েছিলো। বিশেষ করে শোয়েবের সারা দিনে দুটো কলা আর কমলা ছাড়া খাওয়ার মতো কিছু জোটেনি। ওরা মাদুরে বসতেই মকবুল ওদের প্লেটে ভাত তুলে দিলো। সুমন বললো, আমাদের তুলে দিতে হবে না। আমরা নিজেরা নিয়ে খাবো।

গৃহকর্তা তার ছেলেকে নিয়ে চেয়ারে বসে ওদের খাওয়া দেখছিলেন। হেসে বললেন, শহরের ছেলেরা তুলে খাওয়ানো পছন্দ করে না। ঠিক আছে বাবারা, আপনারা নিজেরা তুলে খান। পেট ভরে খাবেন, কোনও লজ্জা করবেন না।

সুমন বললো, আমাদের আপনি করে বলছেন, এতে কিন্তু আমরা লজ্জা পাচ্ছি। আমরা আপনার ছেলের বয়সী, আমাদের তুমি বলবেন।

হা হা করে গলা খুলে হাসলেন গৃহকর্তা–কথা শুনে মনে হচ্ছে শরিফ খানদানের ছেলে। তোমরা কিন্তু নিজেদের নাম বলোনি।

সুমনই সবার নাম বললো। এরপর গৃহকর্তা কে কী, কার বাবা কী করেন, এসব জানতে চাইলেন। রাজা আলীর বাবা নেই। সুমন, ঝন্টু আর রবি বললো ওদের বাবারা কী করেন। শোয়েব জানালো ওর বাবা ব্যবসা করেন। আর পড়ার কথা গোপন করে বললো, ঢাকার এক ওষুধ কোম্পানির জুনিয়র এক্সিকিউটিভ।

কথার ফাঁকে ফাঁকে গৃহকর্তা মকবুলকে বলছিলেন, ওরা কিন্তু কিছুই খাচ্ছে না। মুরগির রানটা শোয়েবের পাতে তুলে দে। রাজার প্লেটে ভাত দে। সুমন ডিমের তরকারি নেয়নি।

গৃহকর্তা নিজের কথাও বললেন। কক্সবাজারে দুটো চিংড়ির ঘের আছে। ধানি জমি আছে সত্তর কানি। এতেই আল্লার রহমতে তাঁর দিন কোনও মতে চলে যায়। দিন যে কিভাবে যায় সুমনরা তাঁর অতিথি আপ্যায়নের ঘটা দেখেই বুঝতে পারছিলো। অচেনা লোকজনদের যে খাতির করছেন চেনাদের ভাগ্যে নিশ্চয় এর চেয়ে বেশি জোটে!

তখনও ওদের খাওয়া হয়নি,এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে এক লোক এসে গৃহকর্তাকে বললো, সওদাগর বাড়ির মেজ মিয়া এসেছেন। আপনাকে ভেতরে যেতে বলেছেন।

লোকটার কথা শুনে গৃহকর্তা ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বাবারা, তোমরা আরাম করে খাও, বলে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তার ছেলে ফজলুল করিম তাঁকে অনুসরণ করলো।

সওদাগর বাড়ির মেজ মিয়া কি এ বাড়ির কুটুম্ব হয়? মকবুলকে প্রশ্ন করলো শোয়েব।

দূর সম্পর্কের কুটুম্বিতা একটা আছে। তবে মেজ মিয়া আমাদের ইউনিয়নের চেয়ারম্যান।

এত রাতে চেয়ারম্যান সাহেব কী করতে এলেন?

সামনে তো চেয়ারম্যান ইলেকশন। ওই বিষয়ে হয়তো কথা বলতে এসেছেন।

খাওয়া শেষ করে মস্ত এক ঢেকুর তুলে শোয়েব বললো, তোমাদের বাড়িতে কি কেউ জাদু জানে মকবুল মিয়া?

কামলা মকবুলকে মিয়া বলাতে ও খুব খুশি হলো। জাদুর কথা শুনে অবাকও হলো–জাদুর কী দেখলেন?

এক ঘণ্টার ভেতর এত সব ভালো ভালো রান্না কে করলো?

আমাদের হুজুরের তিন বিবি। চাকর চাকরাণি আছে ছয় সাত জন। এইটুকু রান্না করতে আর কী লাগে? মুরগি রান্না ভারি চমৎকার হয়েছে।

মুরগির সালুন বেঁধেছেন করিম মিয়ার মা, হুজুরের বড় বিবি সাহেব। তিনি খুব উঁচু খানদানের মেয়ে।

তোমাদের চেয়ারম্যান সাহেব কোন পার্টি করেন?

মকবুলের জবাব দেয়ার আগেই গৃহকর্তা এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর ছেলে করিম মাথায় হেলমেট পরে তৈরি হয়ে এসেছে। তিনি শোয়েবকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের খাওয়া ঠিক মতো হয়েছে তো? আমাদের কুটুম্ব এসেছিলেন বলে উঠে যেতে হলো।

শোয়েব উচ্ছ্বসিত গলায় বললো, অসময়ে কোথাও এত ভালো খাবার আর থাকার জায়গা পাবো আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি চাচা।

গরিবের ঘরে যা ছিলো তাই দিয়ে মেহমানদারি করতে হলো, দিনে যদি আসতে পুকুর থেকে মাছ ধরতাম। ঢাকার মেহমানদের খাতির করার সুযোগ কি আর সব সময় পাওয়া যায়!

করিম দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলো। কক্সবাজার যাওয়ার জন্য ও অনেকক্ষণ ধরে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। বললো, আব্বা, আমাদের এখন যাওয়া দরকার।

গৃহকর্তা ব্যস্ত হয়ে বললেন, হ্যাঁ বাবা শোয়েব, ফজলুল করিমের সঙ্গে তোমরা কে যাবে?

রাজা আলী এগিয়ে এসে বললো, আমি যাবো।

চলুন যাই। এই বলে রাজা আলীকে নিয়ে করিম বেরিয়ে গেলো।

ওর স্কুটারের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পর গৃহকর্তা বললেন, তোমাদের ওপর অনেক ধকল গেছে। শুয়ে পড়ো। এই রাতে রাজা আলী যদি মিস্ত্রি জোগাড় করতে পারেও ওর ফিরতে ফিরতে রাত হবে।

শোয়েব হাই তুলে বললো, হ্যাঁ শোয়া দরকার।

আমি যাই তাহলে? দরজা ভেজিয়ে রাখলেই হবে, বন্ধ করার দরকার নেই। বাইরের বারান্দায় আমাদের দুজন কামলা শশাবে। ভয়ের কিছু নেই। আমাদের এলাকায় চুরি ডাকাতি হয় না বললেই চলে।

গৃহকর্তা বেরিয়ে যাওয়ার পর শোয়েব দরজাটা ভেজিয়ে দিলো। সুমন, ঝন্টু আর রবি বাইরে গেলো প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য। শোয়েব চিন্তিত ছিলো গাড়ির নিরাপত্তা নিয়ে। গৃহকর্তাকে জিজ্ঞেস করা হলো না তিনি লোক পাঠিয়েছেন কিনা। পাঠালেও লাভ নেই। ওরা রাতে এলে দল, বেঁধে আসবে। বাড়ির লোকেরা ওদের ঠেকাতে পারবে না।

বাইরে আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের আধখানা চাঁদ ঝুলছে। মরা জ্যোৎস্নায় ঘরবাড়ি গাছপালা সব কালো অন্ধকারের চাদর গায়ে জড়িয়ে আছে। ঝন্টু বললো, কী অদ্ভুত শান্ত পরিবেশ। ঢাকায় কখনও এমন জোসনা দেখা যাবে না।

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য রবি সামান্য আড়াল খুঁজছিলো। হঠাৎ বাড়ির ভেতর থেকে অন্ধকার কুঁড়ে একটা লোক বেরিয়ে এলো। কাছে আসার পর ওরা মকবুলকে চিনতে পারলো। সুমন আর ঝন্টুকে বাইরে ঘুরতে দেখে মকবুল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা বাইরে কী করছেন?

ঝন্টু বললো, পেশাব করতে বেরিয়েছিলাম। ভারি সুন্দর পরিবেশ। ভাবলাম একটু ঘুরি।

মকবুল গম্ভীর হয়ে বললো, গোরস্তানের পাশে পেশাব করা ঠিক না। হুজুরের দাদাজী ছিলেন জিন্দা পীর। এই গোরস্থানে ওঁর কবর আছে। নাপাক কাজ তিনি পছন্দ করেন না।

সামনে বেতের ঝোপে ঘেরা জায়গাটা যে গোরস্থান ওরা বুঝতে পারেনি। রবি ওদিকেই গেছে পেশাব করতে? মকবুল টের পেলে যদি হইচই–করে সুমন উল্টোদিকে হাঁটতে হাঁটতে ওকে জিজ্ঞেস করলো মকবুল ভাই, আপনাদের বাড়িতে যে চেয়ারম্যান সাহেব এসেছিলেন তিনি চলে গেছেন?

গৃহকর্তা মকবুলকে বলে দিয়েছিলেন, মেহমানরা যেন রাতে বাইরে না বেরোয়। সেজন্য মিন্নাতালি আর মকবুলকে বলেছেন কাঁচারি ঘরের বারান্দায় শুতে। ঢাকা শহর থেকে আসা সাহেবদের সুন্দর ফুটফুটে চেহারার ছেলেটা ওকে আপনি বলে ভাই ডেকেছে–এতেই মকবুল গলে গেলো। গৃহকর্তা ওকে কী বলেছিলেন কিছুক্ষণের জন্য ও ভুলে গেলো। বিগলিত হেসে সুমনকে বললো, এই তো কিছুক্ষণ আগে চেয়ারম্যান সাহেব চলে গেছেন।

শোয়েব যে কথাটা মকবুলের কাছ থেকে জানতে চেয়ে উত্তর পায়নি সুমন সেটা ওর কাছে আবার জানতে চাইলো আপনাদের চেয়ারম্যান সাহেব কি কোনও পার্টি করেন মকবুল ভাই?

মাথা নেড়ে সায় জানালো মকবুল চেয়ারম্যান, মেম্বার হতে গেলে একটা না একটা পার্টি তো করতেই হয়।

কোন পার্টি করেন তিনি?

জামাতে ইসলামী।

মকবুলের ছোট্ট উত্তর শুনে সুমন আর ঝন্টুর বুকের ভেতরটা গুড় গুড় করে উঠলো। ঝন্টু খুব সাবধানে জিজ্ঞেস করলো, ফজলুল করিম ভাইর আব্বাও কি জামাতে ইসলামী করেন?

এ বাড়ির সবাই জামাতে ইসলামী করেন।

আপনিও করেন?

আমরা হলাম চাকর নফর। দল করা কি আমাদের মানায়?

ততক্ষণে রবি এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ঝন্টু বললো, এখানে পেশাব কোথায় করা যায় মকবুল ভাই?

পাশের পুকুরের দিকে আঙুল তুলে মকবুল বললো, ওই দিকে গিয়ে করে আসেন।

ঝন্টু আর সুমন পুকুরের দিকে গেলো জলবিয়োগ করতে। ওদের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে মকবুলের মনে হলো গৃহকর্তা ওকে কী বলেছিলেন। সুমন আর ঝন্টু জলবিয়োগ সেরে ফিরতেই মকবুল বললো, আপনারা ঘরে না ঢুকলে আমরা তো শুতে পারবো না।

ততক্ষণে রবিও এসে গেছে। ওরা তিনজন কথা না বাড়িয়ে সোজা কাঁচারি ঘরে গিয়ে প্রথমে দরজা বন্ধ করলো। শীত লাগবে বলে ঘরের জানালা আগে থেকেই বন্ধ ছিলো। ওদের চেহারায় চাপা উত্তেজনা আর সতর্ক চলাফেরা দেখে শোয়েব অবাক হয়ে প্রশ্ন করতে যাবে–আঙুলের ইশারায় সুমন ওকে কথা বলতে বারণ করলো।

পা টিপে ওরা সবাই বিছানায় উঠে গোল হয়ে বসলো। ঝন্টু ফিশ ফিশ করে শোয়েবকে বললো, মকবুলের কাছে শুনলাম এটা জামাতীদের বাড়ি। বাড়ির সবাই নাকি জামাত করে। ওদের হাত থেকে বাঁচার জন্য শোয়েব ভাই তুমি ওদেরই গুহায় আশ্রয় নিয়েছে।

শোয়েব ঝট করে উঠে দাঁড়ালো। বারান্দার দিকে ইশারা করে তাকিয়ে বললো, আজ রাতেই পালাতে হবে।

দরজার সামনে ওরা দুজন শুয়ে থাকবে। বললো সুমন।

দরকার হলে সিঁদ কেটে পালাবো।

রাজা আলীকে পাবো কোথায়?

আগে কক্সবাজারে যাবো। রাজা আলীকে না পেলে তুমি তো ডিসিকে বলবে। সুমনকে আশ্বস্ত করলো শোয়েব।

৫-৬. ঘন্টা দুয়েক ঘুমিয়ে

ওদের তিনজনকে শোয়েব বলেছিলো ঘন্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নিতে, ও জেগে পাহারা দেবে। সুমনরা লেপের তলায় গিয়ে শুলেও অনেকক্ষণ কারও চোখেই ঘুম এলো না। ঘন্টা দেড়েক পর বাইরের বারান্দায় মকবুল আর ওর সঙ্গী পাল্লা দিয়ে নাক ডাকা শুরু করলো। কোনও কথা না বলে শোয়েব গায়ে হাত দিতেই ওদের তন্দ্রা কেটে গেলো। বুঝলো যাওয়ার সময় হয়েছে।

শোয়েব খুব সাবধানে বিছানা থেকে নেমে হুড়কো খুলে দরজাটা সামান্য ফাঁক করলো। একটুখানি শব্দ হলো। সামনে দেখলো মকবুলরা দুজন নয়, তিনজন। এমন বিচ্ছিরি ভাবে শুয়ে আছে বেরুতে হলে ওদের গা মাড়িয়ে যেতে হবে। হতাশ হয়ে শোয়েব আবার দরজা বন্ধ করে দিলো। সুমনদের কাছে গিয়ে বললো সিঁদ না কেটে বেরুনো যাবে না।

কিভাবে সিঁদ কাটবে অবাক হয়ে জানতে চাইলো রবি।

ঘরের ভেতর শাবল, খন্তা কিংবা মাটি খোঁড়া যায় এমন কিছু আছে কি না দেখতে হবে।

তিনজন খুব সাবধানে বিছানা থেকে নামলো। হারিকেনের সলতে সামান্য উস্কে দিয়ে তক্তপোষের তলায় ভালো মতো খুঁজলো। ঘরে কেন, আলমারির পেছনে সব কিছু খুঁজেও শাবল জাতীয় কিছু পেলো না। মনে মনে প্রমাদ গুণলো শোয়েব। একটা কিছু খুঁজে বের করতেই হবে। শুধু হাতে মাটি খোঁড়া যাবে না।

অনেকক্ষণ খোঁজার পর বেড়ার গায়ে গোজা একটা খুরপি চোখে পড়লো শোয়েবের। গায়ে জমা মর্চে দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো বহুদিন ওটা কেউ ব্যবহার করেনি। নিঃশব্দে বেড়ার গা থেকে ওটা খুলে শোয়েব। ঝন্টু অবাক হয়ে জানতে চাইলো, এতে হবে।

উত্তেজনায় ওর গলায় সামান্য শব্দ হলো। ঠোঠে-আঙুল চেপে শোয়েব ওদের শব্দ করতে বারণ করলো। ফিশ ফিশ করে বললো, এ দিয়েই কাজ চালাতে হবে।

ওরা তিনজন অবাক হয়ে দেখলো বেড়ার নিচে মাটির মেঝেতে শোয়েব খুরপি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মাটি তুলতে লাগলো। ওদের বিস্মিত চোখের সামনে আধঘন্টার ভেতর ও বাইরে যাওয়ার মতো একটা গর্ত কেটে ফেললো। সুমন শুধু একটু পর পর দরজায় কান লাগিয়ে শোনার চেষ্টা করছিলো মকবুলদের নাক ডাকার ছন্দে কোনও পতন হয় কি না। শোয়েবদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত মকবুলরা তিনজন তিন রকম তালে পাল্লা দিয়ে নাক ডাকছিলো।

ঝামেলা বাধালো কুকুরগুলো। বড় রাস্তায় না ওঠা পর্যন্ত দুটো নেড়ি নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে তারস্বরে ডাকছিলো। রবি একবার মাটির ঢেলা ছুঁড়ে মারতে নেড়ি দুটো এমন চি ৎকার শুরু করলো যে গ্রামের সব কটা কুকুর ওদের সঙ্গে গলা মেলালো।

প্রথমে ঘুম ভাঙলো মকবুলের। চোখ কচলে উঠে বসে টর্চ জ্বালালো। সঙ্গী দুজনকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বললো, মনে হচ্ছে চোর এসেছে। বিনা কারণে মাঝ রাতে এভাবে কুকুর ডাকার কথা নয়।

বাইরে তখন রীতিমতো হিম পড়ছে। চৈত্রের শেষে দিনে মোটামুটি গরম থাকলেও শেষ রাতে রীতিমতো শীত পড়ে। মকবুলের সঙ্গী দুজন খুবই অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে বসলো। একজন বিড় বিড় করে বললো, কুকুরকে নিশি পেলে এরকম ডাকে।

আরেকজন বললো, হাজি বাড়িতে চুরি করতে আসবে কার এমন বুকের পাটা! জানে না বাড়িতে কটা বন্দুক আছে।

মকবুল বললো, ওঠ তোরা আমি গিয়ে বাড়ির চারপাশটা একটু ঘুরে আসি। তোরা ওখানে বসে থাক।

কাঁচারি ঘরে টাকা পয়সা কিছু থাকে না। যা কিছু চুরি বা ডাকাতি হতে পারে সব গৃহকর্তার শোয়ার ঘরের স্টিলের আলমারি আর লোহার সিন্দুকে রাখা। মকবুল সবার আগে বড় ঘরের চারপাশটা ঘুরে দেখলো। গাছের ওপরও টর্চের আলো ফেলে দেখলো কেউ সেখানে লুকিয়ে আছে কি না। বড় ঘর দেখে বিবিদের ঘর দেখলো। কোথাও সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লো না। বুঝতে পারলো না কেন কুকুরগুলো এভাবে চিৎকার করছে।

ভাবতে গিয়ে মকবুলের একাত্তরের কথা মনে হলো। ওদের মনিব বলেন গণ্ডগোলের বছর। তখন গ্রামে যখন পাকিস্তানী সৈন্য কিংবা খাকি পোশাক পরা রাজাকার ঢুকতো কুকুরগুলো এভাবে চিৎকার করতো। হঠাৎ মনে হলো গ্রামে পুলিশ ঢোকেনি তো। ও জানে বাড়িতে এমন সব অস্ত্র আছে যেগুলোর লাইসেন্স পাওয়া যায় না। হুজুরের বড় ছেলে করিম মিয়া একবার বলেছিলো এসব অস্ত্র পুলিশ কিংবা আর্মির নজরে পড়লে বিপদ হবে। যদিও থানার দারোগা মাসে দু একবার এসে জেয়াফত

খেয়ে যান তবু সাবধান থাকা ভালো। এই ভেবে মকবুল গৃহকর্তার ঘরের দরজায় সমানে কয়েক বার। টোকা দিয়ে বললো, হুজুর, একটু দরজা খোলেন।

পনেরো কুড়িটা কুকুর যেভাবে তারস্বরে ডাকছিলো গৃহকর্তারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। মকবুলের গলা শুনে উঠে দরজা খুললেন তিনি। ঘুম জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে।

মকবুল সতর্ক গলায় বললো, গ্রামে মনে হয় পুলিশ এসেছে। কুকুরের ডাক শুনে আমি প্রথমে চোর ভেবেছিলাম। উঠে ভালো মতো দেখেছি। চোর টোর কিছু চোখে পড়েনি।

শহর থেকে ছেলেরা যে এসেছে ওগুলো ঠিক মতো আছে তো?

জ্বী হুজুর আছে।

চল গিয়ে দেখি।

মকবুলকে সঙ্গে নিয়ে গৃহকর্তা কাঁচারি ঘরে এলেন। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিলো। কয়েকবার ডাকাডাকি করার পর গৃহকর্তা মকবুলকে বললেন, পিছনের জানালা খোলা কিনা দেখ।

কাঁচারি ঘরের পেছনে যেতেই জানালার নিচে কাটা সিঁদ মকবুলের চোখে পড়লো। আর্ত চিৎকার করে বললো, হুজুর জলদি আসেন। সর্বনাশ হয়ে গেছে।

গৃহকর্তা ব্যস্ত পায়ে ছুটে গেলেন সেখানে। সিঁদ দেখে মকবুলকে বললেন, এটার ভেতর দিয়ে ঘরে ঢোক। ছেঁড়াগুলোর জিনিসপত্র বোধহয় সব নিয়ে গেছে।

মকবুল খচমচ করে পাকা চোরদের মতো সিঁদের গর্ত দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে আবার চিৎকার করলো। হুজুর ঘরে কেউ নাই।

গৃহকর্তা ধমকে বললেন, দরজা খোল হারামজাদা।

মকবুল দরজা খুলতেই ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকলেন তিনি। টর্চের আলোয় দেখলেন মস্ত বিছানা খা খা করছে। ওদের ব্যাগ, আলনায় রাখা জামা কাপড় কিছুই নেই। দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, ইবলিশগুলো সিঁদ কেটে পালিয়েছে। তোরা নিশ্চয় নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিলি। বাস করে মকবুলের গালে এক প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিলেন তিনি। নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিলি! বলে মকবুলের সঙ্গে সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা চাকর দুটোকে দুটো লাথি মারলেন।

দূরে তখনও তারস্বরে কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছিলো। মকবুলকে তিনি ধমক দিয়ে বললেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিস নাকি। হোন্ডায় করে জলদি যা বজ্জাতগুলো মনে হয় বেশি দূর যেতে পারেনি।

মকবুল ছুটে বেরুতে যাবে, গৃহকর্তা আবার ওকে ধমক দিয়ে ডাকলেন, খালি হাতে কোথায় যাচ্ছিস হারামি। মতিউর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে যা । তোর কাছেও পিস্তল রাখবি। ধাড়িটাকে যেভাবে পারিস আমার সামনে হাজির করবি, শুধু জানে মারবি না।

মতিউর রহমান এ বাড়িতে জায়গীর থাকে, কক্সবাজার কলেজে পড়ে আর সৎ লোকের শাসন চাই বলে কলেজের ছেলেদের হাত পায়ের রগ কাটে।

মকবুলরা চলে যাওয়ার পর হতাশ হয়ে গৃহকর্তা তক্তপোষের ওপর বসলেন। তিনি ভালো মনে করেই ছেলেগুলোকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ভাগ্যিস রাতে চেয়ারম্যান এসেছিলেন। ধাড়ি ছেলেটা নাকি ইউনিভার্সিটি থেকে ওদের দলের খুবই মূল্যবান আর গোপন দলিল চুরি করে পালাচ্ছে। চট্টগ্রাম থেকে উত্তরে ফেণী আর দক্ষিণে কক্সবাজার পর্যন্ত দলের সবগুলো ঘাঁটিতে খবর দেয়া হয়েছে। ওপর থেকে বলা হয়েছে, এই দলিলগুলো উদ্ধার করার জন্য যদি দশটাকেও মারতে হয় মারবে, যে কোনও মূল্যে কাগজগুলো পেতে হবে। এই দলের এটাই একটা সুবিধে। ওপর থেকে আসা যে কোনও হুকুম কর্মীরা বিনা প্রশ্নে তামিল করে।

.

গৃহকর্তা যখন শোয়েবদের কিভাবে কজা করবেন এ নিয়ে আকাশ পাতাল ভাবছেন তখন ওরা চারজন অন্ধকার হাইওয়ে ধরে কক্সবাজারের দিকে দৌড়াচ্ছিলো। মিনিট পনেরো দৌড়োনোর পর অন্যরা ক্লান্ত না হলেও সুমনের হাঁপ ধরে গেলো। ঝন্টু আর। রবির এক ঘন্টা দৌড়ের অভ্যাস আছে। স্কুলে থাকতে শোয়েবও এ্যানুয়াল স্পোর্টস-এ নাম লেখাতো। সুমন মনে মনে ভাবলো ঢাকা ফেরার পর সকালে ঝন্টুর সঙ্গে দৌড় প্র্যাকটিস করবে। বহুদিন ঝন্টু ওকে বলেছে পাত্তা দেয়নি। এখন ওর মনে হচ্ছে বডি ফিট রাখাটা কত দরকার।

শেষের দিকে সুমন যেভাবে টেনে টেনে নিঃশ্বাস ফেলছিলো–ঝন্টুর চোখ পড়লো। দৌড়ের গতি কমিয়ে বললো, একটু বিশ্রাম নেয়া দরকার শোয়েব ভাই।

শোয়েব এত তাড়াতাড়ি বিশ্রাম নেয়ার পক্ষপাতি ছিলো না। মকবুল আর তার দলবল ধাওয়া করছে কি না কে জানে। ওদের সঙ্গে ট্রেইনড কুকুরও থাকতে পারে। এত কিছু ভাববার পরও সুমনের অবস্থা দেখে বাধ্য হয়ে থামতে হলো শোয়েব আর রবিকে। চারপাশে তাকিয়ে শোয়েব বললো আমরা ওই পাথরটার আড়ালে বসতে পারি। হাইওয়ে ধরে কেউ আমাদের খুঁজতে বেরহলেও টের পাবে না।

কথা না বলে সবাই নিরবে শোয়েবেকে অনুসরণ করলো। দূর থেকে ওরা যেটাকে পাথর ভেবেছিলো ওটা ছিলো কারও পরিত্যক্ত বাড়ির উঁচু পাকা ভিটে। শুধু ভিটেটুকুই আছে, দেয়ালের কোনও চিহ্ন নেই। এদিকে জঙ্গলও বেশ ফাঁকা। হাইওয়ে থেকে চোখের আড়াল হলেও শোয়েবের কাছে জায়গাটা নিরাপদ মনে হলো না। কেউ যদি ওদের খুঁজতে বেরোয় এদিকে ঢু মারাটা বিচিত্র নয়। তারপরও রবির অবস্থা দেখে শোয়েব ওর আশঙ্কার কথা বলতে পারলো না।

এয়ার ব্যাগটা মাথার নিচে দিয়ে সুমন হাত পা মেলে শুয়ে পড়েছে। নিঃশ্বাস ফেলছে জোরে জোরে। শোয়েবের মনে হলো মিনিট পনেরো বিশ্রাম না নিলে ও হাঁটতে পারবে না।

পাঁচ মিনিটও হয়নি ওরা বিশ্রাম নেয়ার জন্য বসেছে দূরে মটর সাইকেলের শব্দ শোনা গেলো। একটু আগে শোয়েব ঘড়ি দেখেছে। রাত তখন আড়াইটা। এ সময় কোনও সাধারণ মানুষ ঘর থেকে বেরুবে না। যে আসছে সে নিশ্চয় ওদের বন্ধু নয়। তবু কিছুই করার নেই। ভরসার কথা একটাই। হোন্ডায় করে দুজনের বেশি আসতে পারবে না। শোয়েবরা রয়েছে চারজন। কথাটা মনে হওয়াতে ও একটা স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলতে যাবে। তখনই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো গভীর রাতে ছাত্রদের হল-এ ছাত্র শিবিরের গুণ্ডাদের অস্ত্র হাতে ছুটোছুটির দৃশ্য। হোন্ডায় যারা আসছে তাদের হাতে মেশিন পিস্তল না থাকুক দুটো রিভলভারও যদি থাকে শোয়েবরা নিরস্ত্র চারজন কিছুই করতে পারবে না।

নিজেকে এক রকম ভাগ্যের হাতে সপে দিয়ে কাঠ হয়ে বসেছিলো শোয়েব। শিবিরের ছেলেদের নৃশংসতার কথা সুমন, ঝন্টু আর রবি অতটা জানে না, যতটা জানে শোয়েব। তবে সুমনরা এটা বুঝে ফেলেছে শোয়েবকে যদি ওরা ধরতে পারে নির্ঘাত খুন করবে। শোয়েবের সঙ্গী হওয়ার জন্য ওদেরও ছেড়ে দেবে না।

ওদের সবাইকে সাময়িকভাবে উদ্বেগ থেকে রেহাই দিয়ে ভট ভট শব্দ করে হোন্ডাটা কক্সবাজারের দিকে চলে গেলো। বুকের ওপর তো চেপে বসা আতঙ্কের ভারি বোঝা থেকে কিছুক্ষণের জন্যে মুক্ত হলো শোয়েব। সুমন লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো, এই যাত্রা জানে বেঁচে গেছি–কী বলো শোয়েব ভাই?

শোয়েব শুকনো হেসে বললো, কক্সবাজার না পৌঁছা পর্যন্ত কিছুই বলা যায় না।

সুমন বললো রাতটুকু আমরা বনের ভেতর বিশ্রাম নিয়ে কাটাতে পারি। সকালে একবারে গাড়ি নিয়ে কক্সবাজার চলে যেতাম। আমার মনে হয় রাজা আলী মেকানিক নিয়ে সকালের আগে আসতে পারবে না।

ওদের কাছে দিন রাত সব সমান। শোয়েব শান্ত গলায় সুমনকে বললো, তুমি যা ভাবছো, ওরাও তোমার মতোই ভাববে। গাড়ির আশে পাশে ওদের পাহারাওয়ালা থাকবে। গাড়িতে বোমা জাতীয় কিছু ফিট করে রাখাটাও অসম্ভব নয়।

রবি ভয় পাওয়া গলায় জানতে চাইলো–তাহলে আমরা কক্সবাজার যাচ্ছি। কিভাবে?

হেঁটে। শোয়েব জবাব দিলো–রাতে যতটা পারি হাইওয়ে থেকে নেমে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হেঁটে এগিয়ে থাকবো। বাকি পথ দিনে ম্যানেজ করা যাবে।

মাঝ রাতে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটার প্রস্তাব রবির পছন্দ হলো না। কত দিনের পুরোনো জঙ্গল কে জানে। গাড়িতে আসার পথে লক্ষ্য করেছে কোনও কোনও গাছ এত পুরোনো যে গায়ে পুরু শ্যাওলা জমেছে। হিংস্র জন্তু জানোয়ার আর সাপখোপের কথা বাদ দিলেও এ ধরনের জঙ্গলেই অপদেবতারা থাকে। ওদের স্কুলের শুভদারঞ্জন স্যার বলেছেন বনের ভেতর অপদেবতারা কেউ গাছের চেহারা ধরে কেউ পাথর কিংবা পাহাড়ের চেহারা ধরে পড়ে থাকে। সিদ্ধ পুরুষ ছাড়া কেউ ওদের চিনতে পারেন না। বাগে পেলে ওরা মানুষের ঘাড় মটকে দেয় রক্ত শুষে নেয়। এসব কথা অবশ্য রবি সুমনরা বিশ্বাস করে না। গত কয়েক ঘন্টায় শোয়েবের সঙ্গে যতটুকু পরিচয় হয়েছে সেও শুনলে হেসে উড়িয়ে দেবে। খুবই অনিচ্ছার সঙ্গে অসহায় রবি ওদের সঙ্গী হলো।

বনের ভেতর দিয়ে হাঁটলেও ওরা দূরে হাইওয়ের দিকে লক্ষ্য রাখছিলো। হোন্ডায় চেপে যারা কক্সবাজারের দিকে গেছে ওরা যে কোন সময় ফিরে আসতে পারে। এবার এলে হয়তো দল আরও ভারি করে আসবে। চেয়ারম্যান যখন জামাতী গ্রামে ওদের ঘাঁটি বেশ শক্তই বলতে হবে। শোয়েব পত্রিকায় পড়েছে, নিজেও জানে চট্টগ্রাম আর পার্বত্য চট্টগ্রামে ওরা যথেষ্ট শক্তিশালী। ওকে যেভাবে ওরা খুঁজছে কতক্ষণ ওদের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচবে আল্লা মালুম।

ও যা ভেবেছিলো–মিনিট দশেক পরই দক্ষিণের কক্সবাজারের দিক থেকে একটা হোন্ডা বেশ মন্থর গতিতে উত্তর দিকে গেলো। শব্দ শুনে ওরা বুঝতে পেরেছিলো এই হোন্ডাটাই একটু আগে ওদের পাশ কাটিয়ে কক্সবাজারের দিকে গিয়েছে।

হোন্ডার শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝন্টু উত্তেজিত গলায় বললো, একটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করোনি। কী জিনিস? অবাক হয়ে জানতে চাইলো সুমন আর রবি। কক্সবাজারের দিকে যাওয়ার সময় হোন্ডার লোক ছিল তিনজন, এখন দেখছি মাত্র একজন।

কি বলতে চাইছিস তুই?

হয় ওরা দুজন পথের দু পাশে অস্ত্র হাতে আমাদের আপেক্ষা করবে, নইলে সামনের যে গ্রামগুলো ওদের ঘাঁটি–সেখানে আগের মতো ইনফর্ম করবে।

তাহলে আমরা সামনে যাচ্ছি কেন?

শোয়েব বললো, ওদের চোখ এড়িয়ে যেভাবেই হোক আমাদের কক্সবাজার পৌঁছাতে হবে।

সুমন আবারও বললো, রাতটুকু অপেক্ষা করে সকালে গেলে হয় না শোয়েব ভাই? সকালে আমরা রাজা আলীকে না পেলেও বাসে কিংবা ট্রাকে লিফট নিয়ে কক্সবাজার যেতে পারি।

তোর কি হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে সুমন? জানতে চাইলো ঝন্টু।

হ্যাঁ, পা ব্যথা করছে?

সুমনের কথায় রবিও সায় জানালো, রাতটা মনে হয় বনের ভেতর কাটানোই ঠিক হবে।

শোয়েব বললো, ঠিক আছে, সামনের ওই কড়ই গাছের নিচে বসে রাতটুকু কাটিয়ে দেয়া যাবে। তবে সকালেও হাঁটতে হবে। সুমন হাইওয়েতে ওঠা আমি নিরাপদ মনে করছি না।

সুমন বললো, রাতে বিশ্রাম নিতে পারলে সকালে হাঁটতে মোটেই কষ্ট হবে না।

ঝন্টু আর সুমনের ব্যাগে চাদর ছিলো। ঝকড়া পুরোনো কড়ই গাছের নিচে ঘাসের ওপর চাদর বিছিয়ে বসলো সবাই। গাছের চেহারা দেখে অবশ্য রবির মনের ভেতর খুঁত খুঁত করছিলো। তবে রাতের বেলা জঙ্গলের ভেতর হাঁটতে গিয়ে পথ হারিয়ে যদি অশুভ কোনও শক্তির কোপে পড়ে সেই ভয়ে পুরোনো গাছ হলেও কড়ই তলাটাই নিরাপদ ওর মনে হলো। হাত ব্যাগের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লো রবি। ওর মনে হলো ঝন্টুরাজেগে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়া উচিৎ। সুমনের মতো ক্লান্ত না হলেও রবি আর ঝন্টুরও ঘুম পাচ্ছিলো। রাত যদিও শেষ হতে চলেছে–ঘুম ছিলো না শুধু শোয়েবের চোখে। সুমনদের কথা ভেবে নিজেকে ওর অপরাধী মনে হচ্ছিল। বেচারারা কক্সবাজার যাচ্ছিলো বেড়াতে। ও যদি পথের মাঝখানে ওদের গাড়িতে লিফট না নিতো এত সব ঝামেলা হতো না। এতক্ষণে ওদের কক্সবাজারের সার্কিট হাউসের নরম গদি মোড়া বিছানায় ঘুমোনোর কথা। একটু ইতস্তত করে শোয়েব মৃদু গলায় বললো, তোমরা কি আমার ওপর রাগ করেছে সুমন?

সুমন অবাক হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো, এ কথা কেন বলছো শোয়েব ভাই?

আমার জন্য তোমাদের এত সব ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে দেখে আমার খুব খারাপ। লাগছে।

আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা খুব রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছে।

ঝন্টু সায় জানিয়ে বললো, কতগুলো গুণ্ডা, আউটল আমাদের খুঁজছে–ওয়েস্টার্ণ কাহিনীর মতোই রোমহর্ষক মনে হচ্ছে।

শুকনো হেসে শোয়েব বললো, ব্যাপারটা মোটেই রোমাঞ্চকর কিংবা ওয়েস্টার্ণ কাহিনীর মতো রোমহর্ষক নয়। জামাত শিবিরের গুন্ডাদের তোমরা চেনো না। আল্লার নাম নিয়ে এরা যে কোনও জঘন্য কাজ করতে পারে। মানুষ খুন করা, নয়তো হাত পায়ের রগ কেটে দেয়া এদের কাছে খুবই মামুলি ব্যাপার।

ঝন্টু ভয় পাওয়া গলায় বললো, ধরতে পারলে তোমাকে ওরা খুব মারধোর করবে, তাই না শোয়েব ভাই? শুধু মারধোর করে যদি ছেড়ে দেয় তাহলে বুঝতে হবে বনের বাঘ মাংশ ছেড়ে ঘাস খাওয়া শুরু করেছে। কথাটা বলে শোয়েব সবার মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলো–ওরা মারধোর খুব একটা করে না। কম শাস্তি দিতে হলে হাত আর পায়ের রগ কেটে ছেড়ে দেয়, চিরজীবন যাতে পঙ্গু হয়ে থাকতে হয়। শাস্তির মাত্রা সামান্য বাড়লে কবজি থেকে হাত কেটে আলাদা করে ফেলে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ওদের শত্রুদের ওরা প্রাণে মেরে ফেলতেই পছন্দ করে।

শোয়েবের কথা শুনে সুমন আর ঝন্টু আঁতকে উঠলো। ভাগ্যিস রবি ঘুমিয়ে পড়েছিলো। নইলে কয়েক রাতের জন্য ওর ঘুম হারাম হয়ে যেতো।

.

৬.

ভোরে শোয়েবের ডাকে সুমন, ঝন্টু আর রবির ঘুম ভাঙলো। ঝন্টু লক্ষ্য করলো শোয়েবের চোখে রাত জাগার ছাপ। বললো, তুমি নিশ্চয় সারা রাত এক ফোঁটাও ঘুমোওনি শোয়েব ভাই?

শোয়েব ম্লান হেসে বললো, ঘুম না এলে ঘুমোবো কিভাবে? একটু থেমে আপন মনে বললো, মনে হয় না আর কখনও স্বাভাবিক পরিবেশে ঘুমোতে পারবো।

শোয়েবের কথা হেসে উড়িয়ে দিলো ঝন্টু, তুমি যে কী বলল শোয়েব ভাই! তোমার সঙ্গে আমরা আরও তিনজন আছি, রাজা ভাইকে ধরলে চার জন। এটা কি মগের মুলুক!

রাতের অন্ধকারে কোনও সাধারণ বিপদকেও অনেক বড় মনে হয়, যা দিনের আলোয় তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া যায়। তারপরও শোয়েব কিছুতেই দুশ্চিন্তার ভারি বোঝ মাথার ওপর থেকে নামাতে পারছিলো না। সুমন বললো, আমাদের এখনই রওনা হওয়া দরকার। কক্সবাজার পৌঁছে বাবাকে ফোন করে সব জানাতে হবে। আমাদের গাড়িটা উদ্ধারের জন্য ডিসিকে বলতে হবে।

রবি বললো, গাড়ির ভেতর শোয়েব ভাইর দরকারী সব কাগজ রয়েছে।

কাগজগুলো নিয়ে শোয়েব খুবই চিন্তিত ছিলো। ওর ভয় হচ্ছিলো টের পেলে ওরা গাড়িটা আস্ত রাখবে না। ভয়ের ভাবনা চেপে রেখে ঝন্টুদের বললো, চলো সবাই। সুমন ঠিকই বলেছে। দুপুরের আগেই আমাদের কক্সবাজার পৌঁছাতে হবে। তৈরি হওয়া মানে পাশের খালের পানিতে মুখ হাত ধুয়ে ব্যাগটা কাঁধে ফেলে দক্ষিণে যাত্রা আরম্ভ করা। আধঘন্টার ভেতর ওরা খিদে পেটে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দক্ষিণ মুখো হাঁটা আরম্ভ করলো।

ঘন্টা খানেক হাঁটার পরও ওদের চোখে কোনও জনবসতি চোখে পড়লো না। ঝন্টু বলেছিলো বড় রাস্তার কাছাকাছি হাঁটতে। শোয়েব আপত্তি করেছে। বড় রাস্তা দিয়ে ওদের লোকজন নিশ্চয় সকাল থেকে যাওয়া আসা করছে। ওদের কারও চোখে পড়লে পালাবার আর উপায় থাকবে না।

রবি জিজ্ঞেস করলো, শোয়েব ভাই, আমরা ঠিক পথে যাচ্ছি তো? ক্ষিদের চোটে পেটের নাড়িভুড়ি হজম হয়ে যাচ্ছে।

শোয়েব চিন্তিত গলায় বললো, এদিকে আমি আগে কখনো আসিনি। তবে ম্যাপ সম্পর্কে আমার ধারণা খারাপ না। দক্ষিণে হাঁটলেই কক্সবাজার পৌঁছানো যাবে।

জঙ্গলের ভেতর উত্তর দক্ষিণ সবই আমার কাছে সমান মনে হচ্ছে। মন্তব্য করলো সুমন।

সকাল বেলা দক্ষিণে হাঁটতে গেলে সূর্য তোমার বাঁ পাশে থাকবে। বিপদ হবে সূর্য যখন মাথার ওপর থাকবে। তার আগে কোনও না কোনও গ্রাম চোখে পড়বেই। জঙ্গলের ভেতর গাছপালা কোথাও ঘন, কোথাও হালকা। মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গাও ওদের পেরুতে হচ্ছিলো। বোঝা যায় এক কালে সেখানে জঙ্গল ছিলো, লোকজন গাছ কেটে সাফ করে ফেলেছে। কাটা গাছের গোড়া দেখে মনে হয় কিছু সদ্য কাটা। সুমন বললো, জঙ্গলের ভেতর যারা চুরি করে গাছ কাটে ওদের গুলি করে মারা উচিৎ।

শোয়েব মৃদু হেসে বললো, গুলি পরে করলেও চলবে। আপাতত ওদের কারও বাড়িতে আশ্রয় পাওয়া দরকার। ক্ষিদে আমারও কম পায়নি।

সুমন ভুরু কুচকে বললো, তুমি বলতে চাইছে গাছ কাটা শয়তানদের বাড়িতে আশ্রয় নেবে?

শোয়েব কিছু বলার আগে রবি বললো, যে শয়তানই হোক যদি খেতে দেয় আমি ওর বাড়ি যেতে রাজি।

আমি কোনও চোরের বাড়িতে খাবো না।

ঠিক আছে, তুই কক্সবাজারে গিয়ে পোলাও কোর্মা খাস। আমরা সামনে যাকে পাবো তার কাছেই খাবার চাইবো।

ক্ষিদে সুমনেরও লেগেছিলো। তারপরও খাওয়ার জন্য রবির হ্যাংলায়মা ওর ভালো লাগলো না। ঝন্টুর ভাব সাব দেখে মনে হচ্ছে সেও রবির দলে। সুমন এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে শোয়েবের পেছনে চুপচাপ হাঁটতে লগালো।

ঘন জঙ্গল পেরিয়ে ওরা খোলা এক মাঠে নেমেছে, ঠিক তখনই দূরে বন্দুকের গুলির শব্দ হলো। চারজন এক সঙ্গে থমকে দাঁড়ালো। সকলের চোখে প্রশ্ন। বুঝতে পারলো না আর সামনে এগুনো ঠিক হবে কি না। মিনিট খানেক পর আবার গুলির শব্দ হলো। শোয়েব চাপা গলায় বললো, পিছিয়ে এসো। খোলা জায়গায় থাকা ঠিক হবে না।

সুমন, ঝন্টু আর রবি কোনও কথা না বলে শোয়েবকে অনুসরণ করলো। সূর্য তখন ঠিক মাথার উপর। বাতাস না থাকাতে বেশ গরমই লাগছিলো। চৈত্রের রোদে অনেকক্ষণ একটানা হাঁটার পর থমকে দাঁড়ানোতে সবাই কুল কুল করে ঘামতে লাগলো। সবচেয়ে বেশি ঘামছিলো রবি যত না গরমে তার চেয়ে বেশি ভয়ে। কেউ কোনও কথা বলছে না দেখে ও চাপা গলায় বললো, তোমার কী মনে হচ্ছে শোয়েব ভাই? কারা গুলি করছে?

বুঝতে পারছি না কারা বিভ্রান্ত গলায় জবাব দিলো শোয়েব।

সুমন বললো কোনও শিকারী টিকারী নয়তো?

এই জঙ্গলে শিকার করার মতো কোনও জন্তু নেই। পূর্ব দিকের পাহাড়ের ওপার থেকে গুলির শব্দ এলে না হয় বুঝতাম কেউ শুয়র মারতে বেরিয়েছে।

পাহাড়ের ওপারে কারা শুয়র মারবে? প্রশ্ন করলো ঝন্টু।

পাহাড়ের উপজাতিদের অনেকে শুয়র খায়। ওরাই মারে।

গুলির শব্দ আসছিলো পশ্চিম দিক থেকে। মিনিট পাঁচেকের ভেতর আরও চার রাউন্ড গুলির শব্দ হলো। শোয়েব বললো, চলো আমরা পুব দিকে সরে যাই।

পুব দিকে মাইল দুয়েক দূরে উঁচু পাহাড়। জঙ্গল ওদিকে ক্রমশঃ ঘন হয়ে গেছে। জঙ্গলের ভেতর বুনো লতা, বেতের কাটা আর ঝোঁপ ঝাড় ঠেলে হাঁটতে হাঁটতে সুমন বললো, আমরা যে উল্টো দিকে যাচ্ছি আবার পথ চিনে ফিরে আসতে পারবো তো শোয়েব ভাই?

আকাশের সূর্য দেখে দিক ঠিক করবো। জবাব দিলো শোয়েব। আমি দেখতে চাই গুলি যারা ছুঁড়ছে তারা ওদের লোক কি না।

ওদের মানে?

কেন, জামাতীদের।

তোমার কি মনে হয় ওরা জঙ্গলের ভেতর আমাদের অনুসরণ করছে?

করাটা বিচিত্র কিছু নয়।

ওরা জানবে কী করে আমরা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কক্সবাজার যাচ্ছি।

ওদের আন্ডার এস্টিমেট কোরো না। ওরা এতক্ষণে বুঝে গেছে আমরা হাইওয়ে ধরে কক্সবাজার বা চট্রগ্রাম যাচ্ছি না। তাহলে সম্ভাবনা একটাই, আর সেটা হলো জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাওয়া। এটা ওদের না বোঝার কথা নয়।

ওরা যত হাঁটছিলো থেমে থেমে গুলির শব্দ ক্রমশঃ এগিয়ে আসছিলো। ঝন্টু বললো, ওরা আমাদের নিশ্চয় দেখতে পায়নি। অকারণে ওরা গুলি ছুড়ছে কেন?

ঝন্টুর কথা শুনে শোয়েব থমকে দাঁড়ালো। ওর চেহারা দেখে মনে হলো ভীষণ ভয় পেয়েছে। ফিশ ফিশ করে বললো, দাঁড়াও, মনে হচ্ছে ওরা আমাদের পুব দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। ওরা নিশ্চয় টের পেয়েছে। আমরা যে এদিকে কোথাও আছি।

উত্তেজিত গলায় সুমন বললো, ওরা যদি আমাদের পুব দিকে সরিয়ে নিতে চায় আমরা সেদিকে যাচ্ছি কেন? আমাদের উচিৎ দক্ষিণে যাওয়া।

দক্ষিণে গেলে ফাঁকা মাঠে গিয়ে পড়বে। তখন আর ওদের কষ্ট করে খুঁজতে হবে না।

ঝন্টু বললো, এখানে একটু দাঁড়াও শোয়েব ভাই। বুঝতে দাও গুলি করতে করতে কেউ এদিকে আসছে কিন না।

শোয়েব মাথা নেড়ে সায় জানালো। বেশ কিছুক্ষণ গুলির শব্দ শোনা গেলো না। রবি হাঁপ ছেড়ে বললো, মনে হচ্ছে যারা গুলি করছিলো ওরা চলে গেছে।

শোয়েব বললো, চলে যেতে পারে, আবার এদিকেও আসতে পারে। যদি মনে করে .....।

শোয়েবের কথা শেষ না হতেই, মনে হলো পুব দিক থেকে শুকনো পাতা মাড়িয়ে ঝোঁপ ঝাড় ঠেলে কি যেন ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। ওদের চারজন সভয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলো। মোটা এক সেগুন

গাছের আড়ালে ছিলো ওরা। শব্দ শুনে মনে হচ্ছিলো কোনও বন্য প্রাণী ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। রবি কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, শোয়েব ইশারায় ওকে চুপ থাকতে বললো।

কিছুক্ষণ পর সামনে ঝোঁপ ঠেলে যাকে বেরিয়ে আসতে দেখলো তার জন্য ওরা বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলো না। শোয়েবেরই বয়সী হবে, হালকা পাতলা রোগাটে গড়নের এক তরুণ ভীত সন্ত্রস্ত চোখে পেছনে আর ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে তাকাতে ওদের দিকে এগিয়ে আসছিলো।

পরনে কালো প্যান্ট, গায়ে নীল জিনসের জ্যাটেক, চোখে বেশি পাওয়ারের চশমা, চুল উসকো খুসকো, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি–ছেলেটা সেগুন গাছের গায়ে ধাক্কা খেতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলো। থমকে দাঁড়িয়ে প্রথমে চোখের সামনে গাছটাকে দেখলো। তারপরই শোয়েবদের ওপর চোখ পড়লো। শোয়েবরা চার জন বিস্মিত চোখে ছেলেটাকে দেখছিলো। ওদের চোখের সামনে ছেলেটার মুখ কাগজের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। মনে হলো চিড়িয়াখানার হিংস্র বাঘের খাঁচায় বুঝি ওকে কেউ নামিয়ে দিয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে যেন ও জ্ঞান হারাবে।

প্রথমে কথা বললো শোয়েব–আমাদের দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মনে হচ্ছে আপনি বিপদে পড়েছেন?

ছেলেটা কোনও রকমে ঢোক গিলে বললো, হ্যাঁ, আমাকে কিছু বাজে লোক তাড়া করছে।

বাজে লোক মানে ডাকাত?

সাধারণ ডাকাত নয়। তার চেয়েও ভয়ঙ্কর।

খুলে বলুন। অধৈর্য গলায় জানতে চাইলে শোয়েব। একটু ইতস্তত করে ছেলেটা বললো, এরা একটা পালিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে জড়িত।

পার্টি মানে? জামাতের কথা বলছেন?

হ্যাঁ জামাত শিবিরের গুন্ডারা আমাকে ধাওয়া করছে। ওর কথা শুনে ঝন্টু, রবি আর সুমন নিজেদের ভেতর দৃষ্টি বিনিময় করলো। শোয়েব বললো, শিবির কেন আপনাকে ধাওয়া করবে? আপনি কে?

আমার নাম মাহবুব। আমি কক্সবাজার কলেজের ছাত্রলীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট। দুদিন আগে ওরা আমাকে জোর করে ধরে এনে রাবেতা কমপ্লেক্স-এ একটা ঘরের ভেতর আটকে রেখেছিলো। আমি কাল রাতে জানালার শিক আলগা করে পালিয়ে এসেছি।

আপনাকে ধরে এনেছিলো কেন?

ওরা আমাদের কলেজের শহীদ মিনার ভেঙে ফেলেছিলো। তারপর আমরা অন্য সব ছাত্র সংগঠন মিলে ওদের মেরে কলেজ থেকে বের করে দিয়েছিলাম। আমাকে একা বেকায়দায় পেয়ে ধরে এনেছিলো। একটু থেমে মাহবুব বললো, আপনারা কারা?

শোয়েব সামান্য হেসে মাহবুবের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো আমি আর আপনি একই নৌকার যাত্রী। আমার নাম শোয়েব। চিটাগং ইউনির্ভাটিতে পড়ি। শিবিরের গুন্ডারা আমাকেও খুঁজছে।

কেন? অবাক হয়ে জানতে চাইলো মাহবুব।

ওদের মৃত্যুবাণ আমার হাতে। এই বলে শোয়েব ওকে সংক্ষেপে ওর পালাবার কারণ বললো। তারপর সুমন, ঝন্টু আর রবিকে ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো।

মাহবুব সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে সামান্য হেসে বললো, এমন দুঃসময়ে আপনাদের পেয়ে মনে হচ্ছে আল্লা বুঝি আকাশ থেকে ফেরেশতা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

শোয়েব দু পা এগিয়ে মাহবুবকে বুকে জড়িয়ে ধরলো এখন থেকে আমরা বন্ধু। কী বলল মাহবুব?

মাহবুব আবেগ রুদ্ধ গলায় বললো, আমাকে বন্ধু ভাবার জন্য অনেক ধন্যবাদ শোয়েব।

সুমন মৃদু হেসে ঝন্টুকে বললো, আমরা তাহলে শোয়েব ভাইর মতো মাহবুব ভাইকেও তুমি বলবো।

নিশ্চয়ই তুমি বলবে। মাহবুবের মুখেও হাসি ফুটলো–আমার এখনও মনে হচ্ছে আমি স্বপ্ন দেখছি।

রবি হেসে বললো, স্বপ্নের ভেতর ক্ষিদে পায় না মাহবুব ভাই। তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে দুদিন তুমি কিছু খাওনি।

ঠিক ধরেছো। কাল সন্ধ্যায় শুধু এক কাপ চা আর দুটো রুটি খেতে দিয়েছিলো।

তুমি সকালে ওদের নাশতার জন্য অপেক্ষা না করে রাতে পলিয়ে গেছে। তোমাকে উপোষ রাখার জন্য ওদের দায়ী করতে পারতে না মাহবুব।

আল্লা মালুম, আজ সকালে নাশতা দিতো-না হাত পায়ের রগ কেটে রাস্তার ধারে ফেলে রাখতো।

ওদের হাতে ধরা পড়লে আমাদেরও একই দশা হবে।

মাহবুবের দেখা পাওয়ার আগে থেকেই গুলির শব্দ থেমে গিয়েছিলো। শোয়েব ওকে প্রশ্ন করলো ওরা কি জেনে ফেলেছিলো তুমি যে এই জঙ্গলে লুকিয়েছ?

মনে হয় না। আমি তো শেষ রাতে পালিয়েছি। ওদের কারও নজরে পড়ার কথা নয়। হতে পারে ওরা ধারণা করেছে আমি জঙ্গলে লুকিয়েছি।

শোয়েব মাথা নাড়লো–তাই হবে। সাড়া শব্দ না পেয়ে ওরা ভেবেছে তুমি বোধহয় অন্য কোথাও লুকিয়েছে।

ঝন্টু বললো, এখন কী করবে শোয়েব ভাই? সুমন বললো, দলে যখন ভারি হয়েছি হাইওয়ের দিকেই যাই না কেন শোয়েব ভাই?

মাহবুব ভীত গলায় বললো, না সুমন। দলে আমরা যত ভারিই হই না কেন, আমদের কাছে অস্ত্র নেই। ওদের সবার কাছে অটোমেটিক পিস্তল নয় বন্দুক রয়েছে।

হাইওয়েতে নিশ্চয় এখন গাড়ি চলাচল করছে। পেট্রল পুলিশও থাকতে পারে।

ম্লান হেসে মাহবুব বললো, পুলিশের ভেতরও ওদের লোক রয়েছে। কে জানে ওরা আমাকে খোঁজার জন্য পুলিশ লাগিয়েছে কি না।

মাহবুবের কথা সমর্থন করলো শোয়েব তুমি ঠিক বলেছো মাহবুব। আমরা এখানে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিশ্চিত হতে চাই ওরা জঙ্গলে আছে না চলে গেছে। ওরা চলে গেলে আমরা জঙ্গলের ভেতর দিয়েই কক্সবাজারের দিকে হাঁটবো।

কক্সবাজার এখান থেকে কত দূর হবে মাহবুব ভাই? জানতে চাইলো রবি। বেচারা ক্ষিদেয় একেবারে অস্থির হয়ে পড়েছিলো।

একটু ভেবে মাহবুব বললোঃ তিন চার মাইলের মতো হবে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গেলে ঘন্টা দুয়েক লাগবে।

তার আগে পথে কি কোনও গ্রাম-টাম পড়বে না?

তা পড়বে। স্কুলে থাকতে এদিকে স্কাউটিঙে আসতাম।

তুমি স্কাউট ছিলে? উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো ঝন্টু।

মাথা নেড়ে সায় জানালো মাহবুব–তার মানে তুমিও স্কাউট?

হাঁ মাহবুব ভাই। গর্বিত গলায় ঝন্টু বললো, আমাদের হচ্ছে ফিফথ ঢাকা ট্রুপ।

শোয়েব হেসে বললো, তাহলে স্কাউটরা, তোমরাই আমাদের পথ দেখাও।

ওর কথার ধরনে মাহবুবও হেসে ফেললো–মনে হচ্ছে তুমি দলপতির দায়িত্ব থেকে স্বেচ্ছায় সরে যেতে চাইছো শায়েব?

অসহায় ভাব করে শোয়েব বললো, দু দুটো জলজ্যান্ত স্কাউট থাকতে আমি কি করে দলনেতা হই।

তাহলে চলে যাওয়া যাক। দলপতির মতো গলাটা গম্ভীর করে বললো মাহবুব।

তথাস্তু। বলে শোয়েব ওকে অনুসরণ করলো। সুমন, ঝন্টু আর রবি মৃদু হেসে নিজেদের ভেতর দৃষ্টি বিনিময় করলো। ওরা লক্ষ্য করেছে মাহবুবকে পেয়ে শোয়েবের ভয় অনেক কেটে গেছে।

ঘন্টা খানেক হাঁটার পর ওরা দূরে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় দুটো ছনের ঘর দেখতে পেলো। মাহবুব বললো, তোমরা এখানে অপেক্ষা করো। বেশি লোক দেখলে ওরা ঘাবড়ে যেতে পারে।

শোয়েবদের দাঁড় করিয়ে রেখে মাহবুব গেলো খাবারের খোঁজে। দূর থেকে ওরা লক্ষ্য করলো মাহবুবকে দেখে ঘরের ভেতর থেকে মঙ্গোলিয়ান চেহারার মাঝবয়সী এক লোক বেরিয়ে এলো। মাহবুব লোকটার সঙ্গে মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে কি যেন বললো। তারপর লোকটা ঘরের ভেতরে গিয়ে একটা পলিথিনের ব্যাগ ভর্তি কিছু জিনিস এনে মাহবুবের হাতে তুলে দিলো। দুজন আরও কিছুক্ষণ কথা বললো। মাহবুব পকেট থেকে সম্ভবত টাকা বের করে দিলো লোকটাকে। তারপর শোয়েবদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।

রবি উত্তেজিত গলায় বললো, মাহবুব ভাই ঠিকই ম্যানেজ করে ফেলেছে।

কাছে এসে মাহবুব বললো, কিছু চিড়া আর বুনো কলা পাওয়া গেছে।

দারুণ বলেই হাত বাড়িয়ে দিলো রবি–জলদি বের করো মাহবুব ভাই। ক্ষিদের চোটে জান বেরিয়ে যাচ্ছে।

শোয়েব বললো, আগে কলা খাওয়া যাক। চিড়া খেলেই পানির তেষ্টা লাগবে।

ওপাশটায় একটা পাহাড়ী ঝর্ণা আছে। পুব দিকে ইশারা করে মাহবুব বললো, ওদিকে চলল। এখানে থাকা নিরাপদ নয়।

মাহবুবের সঙ্গে ঝর্ণার দিকে হাঁটতে হাঁটতে শোয়েব বললো, নিরাপদ নয় কেন বলছো মাহবুব?

বলছি! আগে গলাটা ভিজিয়ে নিই। অল্প কিছুক্ষণ হাঁটার পরই ঝর্ণাটা ওদের চোখে পড়লো।

ঝর্ণার চেহারা দেখে সুমন, ঝন্টু, রবি কেউই খুশি হতে পারলো না। ঝর্ণা না বলে সরু নালা বললেই ঠিক হতো। মাহবুব নিচে নেমে এক আজলা পানি তুলে মুখে দিয়ে বললো, চমক্কার ঠান্ডা পানি। এসো সবাই।

ওরা চারজন কয়েক আজলা ঝর্ণার পানি গিলে, মুখ হাত ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসলো। মাহবুব যে কলাগুলো এনেছিলো–আকারে ছোট হলেও খেতে বেশ মিষ্টি। চিড়ার সঙ্গে কলা খেতে খেতে মাহবুব বললো, লোকটা বললো সকালে নাকি দুজন লোক এসে তোমাদের খোঁজ করে গেছে।

মানে? অবাক হয়ে জানতে চাইলো শোয়েব।

বেলা দশটার দিকে দুটো লোক এসেছিলো। ওদের বাড়িতে। লোক দুটোর মুখে চাপদাড়ি আর সঙ্গে বন্দুক ছিলো। জিজ্ঞেস করেছে তিনটা কমবয়সী আর একটা জোয়ান ছেলেকে ওরা কেউ এদিক দিয়ে যেতে দেখেছে কিনা। বলেছে যদি খবর দিতে পারে তাহলে একশ টাকা বখশিশ দেবে।

বলো কি মাহবুব? শোয়েবের গলা দিয়ে চিড়া নামতে চাইলো না। কোথায় খবর দিতে বলেছে?

দক্ষিণে আধ মাইল দূরে ওদের ক্যাম্প আছে। লোকটা চেনে। বললো, ক্যাম্পে নাকি জোয়ান ছেলেরা অস্ত্র চালানো শেখে।

কী সাংঘাতিক! আঁতকে উঠলো রবি–আমরা তো একটু হলে ওদের ক্যাম্পে গিয়ে উঠতাম!

এখন কী হবে মাহবুব? উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করলো শোয়েব।

আমাদের আরও পুব দিকে সরে যেতে হবে। এই ঝর্ণা ধরে মাইল খানেক গেলে একটা সুরু রাস্তা পড়বে। কাঠুরিয়ারা ওই পথ দিয়ে শহরে যায়।

পথের আশেপাশে শিবিরের ক্যাম্প নেই তো?

লোকটা তো বললো নেই।

তাহলে চলল, বসে থেকে সময় নষ্ট করার দরকার নেই। বেলা থাকতে থাকতে আমাদের কক্সবাজার পৌঁছানো দরকার।

চিড়া আর কলা খেয়ে ওদের সবার পেট ঠান্ডা হয়েছিলো। আরেক দফা ঝর্ণার পানি খেয়ে ওরা পুব দিকে হাঁটলো। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে।

মিনিট পনেরো হাঁটার পর জঙ্গল আবার ফাঁকা হয়ে এলো। আশে পাশে গাছ কাটার চিহ্ন চোখে পড়লো। সুমন বললো, এই জঙ্গলে গাছ কাটা নিশ্চয় বেআইনি মাহবুব ভাই?

মাহবুব বললো, ঠিক ধরেছো। এগুলো চোরদের কাজ।

আরও কিছুক্ষণ হাঁটার পর ওদের চোখে পড়লো কয়েকটা লম্বা ছন আর বেড়ার ঘর। বেশ দূরে ফাঁকা জায়গায় ইতস্তত ছড়ানো। তবে আশেপাশে কোনও মানুষ নেই।

মাহবুব বললো, তোমরা এখানে দাঁড়াও। দেখে আসি গ্রামের ওপর দিয়ে যাওয়াটা নিরাপদ হবে কি না।

আগের মতো ওদের দাঁড় করিয়ে রেখে মাহবুব গ্রামের দিকে এগিয়ে গেলো। সুমনরা লক্ষ্য করলো এদিকের ঘরগুলো সব মাচার ওপর। তলাটা ফাঁকা। শোয়েবের কাছে রবি জানতে চাইলো, ঘরগুলো মাটির অতো ওপরে কেন?

বন্য জন্তু জানোয়ারের হামলা থেকে বাঁচার জন্য উপজাতীয় লোকেরা এভাবে ঘর বানায়।

সুমন লক্ষ্য করলো মাহবুব ইতস্তত না করে সোজা একটা ব্যারাকের মতো ঘরে সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে উঠে গেলো, যেন ওর অনেক পরিচিত। ও ঘরে ঢুকেছে এক মিনিটও হয়নি তীব্র শব্দে একটা হুইসেল বেজে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকটা হুইসেল বাজলো।

শোয়েব, সুমন, ঝন্টু আর রবি হতবাক হয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখলো, যেন মাটি কুঁড়ে উঠে এসেছে দশ বারো জন ভয়ঙ্কর দর্শন লোক। সবার হাতে স্টেনগান ধরা, পরনে কালো পোষাক,মুখে দাড়ি। একজন চিৎকার করে বললো, সবাই হাত তুলে দাঁড়াও। নইলে মেশিন গানের গুলিতে শরীর ঝাঁঝড়া হয়ে যাবে।

শোয়েবরা কোনও কথা না বলে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়ালো। চারজন লোক এসে ওদের শক্ত করে পিছ মোড়া করে বেঁধে ফেললো।

৭-৯. হুইসেল বাজানো

হুইসেল বাজানো থেকে শুরু করে শোয়েবদের চারজনের হাত বাঁধা পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটা এমনভাবে ঘটে গেলো যে, ওদের বিশ্বাসই হচ্ছিলো না ওরা শেষ পর্যন্ত জামাতীদের হাতে ধরা পড়েছে। ওদের চমক ভাঙলো যখন ওরা এক ঘন্টা পর নিজেদের আবিষ্কার করলো মাটির নিচের এক পাকা ঘরে।

দূর থেকে যেগুলো খড়ের আর বেড়ার ঘর মনে হয়েছিলো তার ভেতর যে দুটো পাকা ঘর রয়েছে দূর থেকে বোঝার উপায় নেই। ঘরের চালটাই শুধু খড়ের। মেঝে আর দেয়াল নিরেট ইট পাথরের। কর্কশ গলায় এক লোক হামার সাথ চলো, বলে ওদের ধাক্কা মেরে ঠেলে দিলো পাকা ঘরের ভেতর নিচে নামার সিঁড়ি থেকে। ভাগ্যিস ধাক্কাটা বেশি জোরে ছিলো না, তাই ওরা হুমড়ি খেতে খেতে বেঁচে গেছে। অল্প দূরে কে যেন আসরের নামাজের আজান দিলো। আজান শেষ হওয়ার পর চারদিকে কোনও শব্দ নেই। যে ঘরটায় ওদের রাখা হয়েছিলো সেটার ছাদ ঘেষে দু দিকের দেয়ালে দুটো বড় ভেন্টিলেটার। ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার রাস্তা একটাই–যেখান দিয়ে ওদের ঢোকানো হয়েছে। দরজাটা লোহার পাতের। ওদের ভেতরে ঠেলে কর্কশ ভাষী লোকটা বিকট শব্দে দরজা বন্ধ করে চলে যাওয়ার পাঁচ মিনিট পর মুখ খুললো শোয়েব হারামজাদা মাহবুবটা যে জামাতীদের লোক কল্পনাও করতে পারিনি।

সুমন বললো, তুমি কেন, কারও পক্ষে ধারণা করা সম্ভব ছিলো না।

ঝন্টু বললো, বইয়ে পড়েছিলাম চট্টগ্রামের জঙ্গলে বুনো হাতি ধরার জন্য পোষা হাতি ব্যবহার করে। জামাতীরা আমাদের ধরার জন্য একই ফন্দি করেছে।

সবার ভেতর বেশি ঘাবড়ে গিয়েছিলো রবি। ভাঙা গলায় বললো, আমাদের ওরা আটকে রেখে কী করবে শোয়েব ভাই?

শোয়েব শুকনো গলায় বললো, আমাকে যে ওরা জানে মেরে ফেলবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

ওরা যে কাগজগুলো চাইছে ওগুলো দিয়ে দাও না? রবির গলা শুনে মনে হলো ও কেঁদে ফেলবে।

সুমন ম্লান হেসে বললো, তোর কি ধারণা? কাগজ পেলে ওরা শোয়েব ভাইকে ছেড়ে দেবে?

কেন ছাড়বে না?

শোয়েব ভাই ওদের সম্পর্কে এমন সব কথা জেনেছেন যা ওদের পছন্দ নয়।

কাউকে পছন্দ না হলেই মেরে ফেলবে?

ওরা এর চেয়েও তুচ্ছ কারণে মানুষ মারতে পারে।

শোয়েব বললো, একাত্তরে ওরা অকারণেও অনেক বাঙালিকে হত্যা করেছিলো।

তোমাকে মেরে ফেললে আমাদের কী হবে?

ওদের তিন জনের জন্য শোয়েবের খুবই খারাপ লাগছিলো। কিন্তু করারও কিছু ছিলো না। অসহায় গলায় বললো, আমি তোমাদের জন্য খুবই দুঃখিত রবি। আমার জন্যেই তোমাদের এত কষ্ট আর দুর্ভোগ। আমার প্রাণ দিয়েও যদি তোমাদের বাঁচাতে পারি তাই করবো।

ঝন্টু মৃদু ধমকের গলায় রবিকে বললো, তুই মেয়েদের মতো প্যান প্যান শুরু করলি কেন? আমাদের যেভাবেই হোক এখান থেকে পালাতে হবে।

কিভাবে পালাবি? গলায় ঝাঁঝ মিশিয়ে রবি বললো, বাইরে দেখিসনি স্টেনগান কাঁধে ঝুলিয়ে কিভাবে সবাই পাহারা দিচ্ছে।

রাত হোক একটা উপায় ঠিকই বের করে ফেলবো।

রাত হওয়ার আগেই আমাদের গুলি করে মেরে ফেলবে।

সুমন মাথা নাড়লো–তুই একটু বেশি বেশি ভাবছিস রবি। শোয়েব ভাইকে জেরা না করে ওরা কিছু করবে না।

ওপরে ভেন্টিলেটার দিয়ে শোয়েব বাইরে তাকিয়ে দেখলো দিনের আলো ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে। একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। তারপর রাত। কে জানে এই রাতই ওর জীবনের শেষ রাত কি না।

শোয়েবের বাড়ির কথা মনে হলো। ঢাকায় ওর বাবা মা দুই ভাই আর এক বোন থাকে, বোন সবার বড়। ভাইদের ভেতর সবার বড় শোয়েব। ছোট ভাইটা মাত্র ক্লাস ফাইভে পড়ে। ওর বড়টা এবার এইচ,এস,সি দেবে। যতবার বাড়ি যায় মা বার বার বলেন, চট্টগ্রামের যেসব খবর কদিন পর পর কাগজে বেরোয় পড়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে। যায়। তুই বাবা পলিটিক্সের ধারে কাছেও ঘেঁষবি না। রোজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে আমি আল্লার কাছে তোর জন্য দোয়া করি। শোয়েব ভাবলো ঠিক এই মুহূর্তে মা আসরের নামাজ শেষ করে জায়নামাজে বসে ওর জন্য আল্লার কাছে দোয়া করছেন। বাবা মা দুজনই শোয়েবের মুখ চেয়ে দিন গোনেন। কবে ও পাশ করে বেরিয়ে চাকরিতে ঢুকে সংসারের হাল ধরবে। বাবার চাকরির হিসেব করা টাকায় সংসার চালাতে গিয়ে মা হিমশিম খান।

শোয়েবের মুখের দিকে তাকিয়ে সুমনের মনে হলো ও বাড়ির কথা ভাবছে। আস্তে আস্তে বললো, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো শোয়েব ভাই?

কী কথা?

বাড়িতে তোমার কে কে আছেন?

সবাই আছে।

তোমার বাড়ির কথা বলো না। সুমনের মনে হলো শোয়েবকে চুপচাপ ভাবতে দিলে ও আরও ভেঙে পড়বে।

সুমনের কথা শুনে শোয়েবের মনে হলো ও ছেলে তিনটিকে যতটা ছোট ভেবেছে আসলে ওরা তত ছোট নয়। বিশেষ করে সুমন আর ঝন্টু খুবই বুদ্ধিমান ছেলে। শোয়েব ওর বাড়ির কথা সুমনদের বললো, ঢাকায় থাকতে ওর একটা পাহাড়ি ময়না ছিলো। ওকে কেউ বিরক্ত করলে রেগে গিয়ে তুই রাজাকার বলতো। একবার ওদের দূর সম্পর্কের এক মামাকে তুই রাজাকার বলাতে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। আত্মীয়টি আসলেই রাজাকার ছিলো। তাই রেগেমেগে একাকার।

বাইরের আকাশ অন্ধকার হওয়ার আগেই ঘরের ভেতরটা অন্ধকারে ছেয়ে গেলো। ঝন্টু বললো, প্রায় তিন ঘন্টা হতে চললো, এখনও কারও সাড়া শব্দ শুনছি না। আমাদের কথা ওদের বড় কর্তাকে জানাতে ভুলে যায়নি তো!

শোয়েব ম্লান হেসে বললো, যতই ভুলেই যাক কথাটা বড় কর্তার কানে তোলার মতো আরও কেউ নিশ্চয় আছে। আমার মনে হয়–

শোয়েবের কথা শেষ না হতেই লোহার দরজায় ঝমঝম আওয়াজ হলো। রবির চেহারা কাগজের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। ওর মনে হলো এখনই যমদূতের মতো একটা লোক এসে ওদের ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবে। ঝন্টু আর সুমন রবির মতো ভয় না পেলেও ওদের হার্টবিট বেড়ে গেলো। শোয়েবের মনে হলো ওকে জেরা করার জন্য নিতে এসেছে।

যে লোকটা ওদের ধাক্কা মেরে এ ঘরে ঠেলে দিয়েছিলো–থুতনিতে ছাগুলে দাঁড়ি আর গালে মস্ত আঁবওয়ালা সেই লোকটাই টর্চ জ্বালিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো। শেষ সিঁড়ির পাশে দেয়ালে সুইচ টিপে লাইট জ্বালালো। খুবই কম পাওয়ারের বাল্ব, তবু আলো দেখে ওরা কিছুটা স্বস্তি পেলো। লোকটা আগের মতো কর্কশ গলায় শোয়েবকে বললো, এই যে, বড় শয়তান, হামার সাথ চলো। বড় হুজুর এত্তেলা করেছেন।

লোকটার কথা শুনেই মনে হয় বিহারী। জেনেভা ক্যাম্পের বিহারী চট্টগ্রামে এলো কি। করে ভেবে একটু অবাক হলো সুমন। এদের ঘাঁটিতে আসার পর যতজনের কথা শুনেছে কাউকেই চট্টগ্রামের বাসিন্দা মনে হয়নি।

মাহবুব বলেছিলো ওর বাড়ি কক্সবাজার কিন্তু ওর কথার কোনও আঞ্চলিক টান ছিলো না।

লোকটার কথা শুনে শোয়েব উঠে দাঁড়িয়েছিলো। সুমন বললো, ও একা যাবে না। আমরাও সঙ্গে যাবো। নেহী! চিৎকার করে বললো ছাগুলে দাড়ি। তুমহাদের যা বুলবে সেইটাই করতে হবে। যেয়াদা বোলবে না।

এগিয়ে এসে শোয়েবের কনুই ধরলো লোকটা। ওর গা থেকে যে বিটকেল দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিলো–শোয়েবের মনে হলো দুপুরে যা খেয়েছে সব বমি হয়ে যাবে।

শোয়েবকে ধরে নিয়ে চলে গেলোলোকটা। রবি এতক্ষণ কিছু বলেনি, দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসেছিলো। বাইরে থেকে লোহার দরজা বন্ধ করার শব্দ হতেই ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

ঝন্টু উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইলো–কী হলো রবি, কাঁদছিস কেন?

কান্নাভেজা গলায় রবি বললো, শোয়েব ভাইকে ওরা মেরে ফেলবে।

সুমন মাথা নাড়লো–না, এখন মারবে না। ওর কাছ থেকে সব কথা আদায় করে তবে মারবে।

শোয়েব ভাই যদি কিছু বলতে না চায়?

বলতে বাধ্য করবে। টর্চার করবে। তবে জানে মারবে না। মারলে তো সব শেষ। এত সহজে শোয়েব ভাইকে ওরা মারবে না।

শোয়েব ভাইর জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে।

রবিকে সান্ত্বনা দিয়ে ঝন্টু বললো, খারাপ তো আমাদের সবারই লাগছে। কান্নাকাটি না করে এখান থেকে পালাবো কিভাবে তাই ভেবে বের কর।

সুমন বললো, রাজা এখন কী করছে কে জানে। ও যদি জানতো আমরা কোথায়–

রাজাকেও ওরা নিশ্চয় কোথাও আটকে রেখেছে।

.

সুমন যখন রাজার কথা ভাবছিলো ও তখন কক্সবাজারের ডিসির অফিসে। দুপুরে রাজার টেলিফোন পেয়ে সুমনের বাবা হন্তদন্ত হয়ে চট্টগ্রাম থেকে ছুটে এসেছেন কক্সবাজার। ফোনে রাজা শুধু ওঁকে এটুকু বলেছিলো সুমনরা হারিয়ে গেছে। কাল রাত থেকে ওদের কোন খবর নেই। শুনেই সুমনের বাবা বলেছেন, তুমি ডিসি সাহেবের অফিসে অপেক্ষা করো। আমি সন্ধ্যার আগেই কক্সবাজার আসছি।

কক্সবাজারের ডিসি সুমনের বাবার ছেলেবেলার বন্ধু। দুজন একটানা দশ বছর একই স্কুলে পড়েছেন। রাজার সঙ্গে কথা শেষ করেই তিনি ডিসিকে ফোন করে বললেন, হাবিব, আমার ছেলে সুমন কক্সবাজার থেকে হারিয়ে গেছে। সঙ্গে ওর দুই বন্ধুও রয়েছে। পুলিশকে খবর দে। আমি এখনই রওনা হচ্ছি।

পর্যটন কর্পোরেশনের একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে সোজা তিনি ডিসির অফিসে এসেছেন। রাজাকে বললেন, ডিসি সাহেবকে সব খুলে বলো কী হয়েছিলো।

শোয়েবের লিফট নেয়ার ঘটনা থেকে শুরু করে ওদের পেছনে লোক লাগা, গাড়ি খারাপ হওয়া, শোয়েবের গোপন কাগজ গাড়িতে লুকিয়ে রাখা, রাতে সৈয়দ বাড়িতে আশ্রয় নেয়া এক এক করে সব বললে রাজা।

ফজলুল করিমের হোভায় করে ও যখন কক্সবাজারের বিক্রম কার সেন্টারের গ্যারেজে এসে পৌঁছেছে রাত তখন প্রায় এগারোটা। গ্যারাজের মালিক, আধবুড়ো নববিক্রম বড়ুয়া রাতে গ্যারেজে থাকেন। ওকে মেকানিক দেয়ার কথা বলে কোনও লাভ হলো না। তাঁর দুজন মেকানিকই সন্ধ্যেবেলা ছুটি নিয়ে গ্রামের বাড়ি গেছে। ফিরবে পরশু। বড়ুয়া বললেন, রাজা যখন সৈয়দ বাড়ির মেহমান তিনি একটা জিপ ওকে দিতে পারেন। জিপের পেছনে বেঁধে রাজা যদি ওদের গাড়ি বড়ুয়ার গ্যারেজে আনতে পারে তিনি দেখে দেবেন, তবে সকালের আগে নয়।

বড়ুয়ার জিপ নিয়ে রাজা ফজলুল করিমের হোভার পেছন পেছন যখন ওদের গাড়ির কাছে এসেছে, তখন ফজলুল করিম বললো, গাড়ি নিয়ে রাজা একা কক্সবাজার যেতে। পারবে কি না। রাজা বলেছে পারবে। এরপর ফজলুল করিম হোন্ডা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। রাজা বড়ুয়ার জিপের পেছনে ওদের গাড়ি বেঁধে রাত সাড়ে বারোটায় কক্সবাজার এসে পৌঁছায়। বড়ুয়ার গ্যারেজেই ও রাত কাটায়। সকালে বড়ুয়া ওকে বললেন, সৈয়দরা চায় না তোমার গাড়িটা আমি মেরামত করে দিই। বলেছে রাজাকে কায়দা করে যেন ওদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে রাজা বুঝে ফেলেছে সুমনরা বিপদে পড়েছে। ও তখন ফকির সেজে বাসে করে গিয়ে ওদের বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছে। বাড়ির এক কাজের লোকের কাছে শুনেছে রাতে যে মেহমানরা এসেছিলো ওরা নাকি ডাকাতদের দলের লোক। পরিচয় জানাজানি হওয়াতে রাত থাকতেই পালিয়ে গেছে। এরপর রাজা কক্সবাজার এসেই সুমনের বাবাকে ফোন করেছে।

সব শুনে ডিসি বললেন, ছেলেরা যাদের ভয়ে পালাচ্ছিলো না জেনে রাতে তাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলো। হয়তো কোনওভাবে জেনে পালিয়েছে, নয়তো ওদের কোথাও লুকিয়ে রেখে রটিয়ে দিয়েছে ওরা পালিয়েছে।

সুমনের বাবা জানতে চাইলেন, পুলিশ কী করছে। ডিসি বললেন, পুলিশকে আমি বিশেষভাবে টেকনাফের রাস্তার দিকে নজর রাখতে বলেছি। যদি কোনওভাবে বর্ডারের ওপারে পাচার করে দেয় আমাদের খুবই অসুবিধে হবে।

ডিসির আশঙ্কার কথা শুনে সুমনের বাবা মুষড়ে পড়লেন। স্কুল জীবনের বন্ধুর হাত ধরে বিচলিত গলায় বললেন, হাবিব তোরা তো জানিস জামাতীদের ঘাঁটি কোথায়। তোদের যত ইনফর্মার আছে ওদের কাজে লাগা। টাকা যা লাগে আমি দেবো। আমার ছেলেদের যেভাবে পারিস ওদের খপ্পর থেকে উদ্ধার করে দে।

বন্ধুকে আশ্বস্ত করে ডিসি বললেন, তুই এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? তোর ছেলে তো আমার ছেলেরই মতো। ইনফর্মারদের আমি যে সব জায়গায় পাঠানো দরকার অলরেডি পাঠিয়ে দিয়েছি। ছেলেরা যে জামাতীদের খপ্পরেই পড়েছে–নিশ্চিত হতে পারছি না তো। এমনও তো হতে পারে ওরা কোথাও গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে সুমনের বাবা বললেন, ওদের হাতে না পড়লেই রক্ষা। কাগজে তো প্রায়ই দেখি কোথাও না কোথাও ওদের হাতে ছাত্ররা খুন হচ্ছে।

শোন সেলিম, কক্সবাজারে ওদের যে টপ লিডার–আমি তার সঙ্গেও কথা বলবো। সিধে আঙুলে ঘি না উঠলে আমরা আঙুল বাঁকাতে জানি। তোর ছেলেরা ওদের খপ্পরে পড়লেও ওদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

সুমনের বাবা ব্যকুল হয়ে বললেন তুই এক্ষুণি ওদের লিডারের সঙ্গে কথা বল। দরকার হলে আমিও কথা বলবো। আমার ছেলেরা তো ওদের কোনও ক্ষতি করেনি। ওরা শোয়েবকে রেখে আমার ছেলেদের ফিরিয়ে দিক। দরকার হলে আমি ওদের পার্টিকে মোটা টাকা ডোনেশন দেবো।

কক্সবাজারের ডিসি হাবিবুল বাশার একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, সেলিম, তোর ছেলের জন্য তুই যতটা উতলা হচ্ছিস শোয়েবের বাবা মা জানলে তোর চেয়ে কম হবেন না। আমি কখনও শোয়েবকে বাদ দিয়ে তোর ছেলেদের ফিরিয়ে দেয়ার কথা ওদের বলতে পারবো না। যখন জেনেছি চারটা ছেলে বিপদে পড়েছে ওদের চারজনকেই উদ্ধার করা আমাদের কর্তব্য। একটু থেমে ডিসি আবার বললেন, তোর অনেক টাকা আছে জানি। ওদের যে টাকা আছে সে টাকায় হাজারটা সেলিম চৌধুরীকে ওরা কিনতে পারে। তুই ওদের ক টাকা ডোনেশন দিবি?

সুমনের বাবা হতাশ হয়ে বললেন, আমার আসলে মাথা ঠিক নেই। কান্ডজ্ঞান সব হারিয়ে ফেলেছি। তুই ঠিকই বলেছিস। নিজের ছেলের জীবন বাঁচানোর জন্য অন্যকে বিপদে ঠেলে দেয়া খুবই স্বার্থপরতা শুধু স্বার্থপরতা নয়, অমানবিক কাজ।

ডিসি কোনও কথা না বলে টেলিফোনের রিসিভার তুললেন, ওর পিএকে বললেন, ইউনুস মওলানা বাড়িতে না পার্টি অফিসে আছে খবর নিয়ে আমাকে জানাও।

মিনিট পনেরো পরে পি এ টেলিফোন করে ডিসিকে জানালেন, মওলানা ইউনুস গত পরশু জেদ্দা গেছেন, ঢাকায় ওদের পার্টির কী এক মিটিঙ আছে। অন্য নেতারাও সব ঢাকায়।

সুমনের বাবা ভাঙা গলায় জানতে চাইলেন–এবার কী হবে সেলিম?

ব্যাপারটা তুই আমার হাতে ছেড়ে দে। এই বলে ডিসি নিজেই একের পর এক টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন।

.

৮.

কর্কশভাষী বিহারীটা শোয়েবকে এনে হাজির করলো পাশের পাকা বাড়ির একটা কামরায়। চারপাশে তাকিয়ে শোয়েবের মনে হলো কক্সবাজারের জঙ্গলে এ ধরনের ঘর খুবই বেমানান। বড় একটা দামী

সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ওপরটা কালো কাঁচে ঢাকা। ওপাশে রিভলভিং চেয়ারে মাঝবয়সী যে লোকটা বসে আছে ওর গোঁফ দেখে মনে হচ্ছে। আর্মির কোনও হোমরা চোমরা অফিসার হবে, মুখে বসন্তের দাগ, পরনে পাকিস্তানীদের মতো সালোয়ার কোর্তা। বা পাশে সাদা কালো দাঁড়িওয়ালা এক লোক, পরনে আলখাল্লার বদলে থ্রি পিস স্যুট।

ঘরের এক পাশে নরম চামড়ার দামী সোফা। দেয়াল ঘেঁষে রাখা স্টিলের কেবিনেটের ওপর একটা ইলেক্ট্রনিক্স গেজেট, দেখতে অনেকটা সিডি প্লেয়ারের মতো, তবে আকারে অনেক বড়। এক পাশের দেয়ালে কাবা শরিফের ছবিওয়ালা ভেলভেটের বিরাট কার্পেট নকশাকরা কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো।

গোঁফওয়ালা আর্মি অফিসার টাইপের লোকটা খসখসে গলায় শোয়েবকে উর্দুতে বললো, বায়ঠো।

কথা শুনেই শোয়েব বুঝলো লোকটা পাকিস্তানী। ওর হাত তখনও পিছমোড়া করে বাঁধা। হাত বাঁধা অবস্থায় হাতলওয়ালা চেয়ারে বসতে অসুবিধে হবে ভেবে শোয়েব দাঁড়িয়ে রইলো। পাকিস্তানীটার পাশে বসা সাদাকালো দাড়িওয়ালা লোকটা বিহারীটাকে বললো, এর হাত খুলে তুমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াও।

জী সরকার। বলে দ্রুত হাতে শোয়েবের বাঁধন খুলে বিহারীটা ঘরে থেকে বেরিয়ে গেলো।

গলাটা যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে পাকিস্তানীটা বললো; আব বায়ঠো।

শোয়েব গদি মোড়া চেয়ারে বসার পর আগের মত নরম গলায় লোকটা বললো, কফি পিয়োগি?

গলা যতই নরম করার চেষ্টা করুক না কেন, লোকটার চেহারায় এমন এক ধরনের নিষ্ঠুরতা ছিলো, মনে হয় ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করতে পারবে। সে তুলনায় সাদা কালো দাড়িকে মনে হচ্ছিলো ধূর্ত আর মতলববাজ টাইপের। কফি খাওয়াটা উচিৎ হবে কি হবে না এ নিয়ে মনস্থির করতে পারছিলো না।

লোকটা আবার আগের মতো নরম করে বললো, বেটা, কফি পিয়োগি?

শোয়েব কোনও কথা না বলে মাথা নেড়ে সায় জানালো।

পাকিস্তানীটা কলিং বেল টিপে এক উর্দিপরা বেয়ারাকে তিন কাপ কফি আনতে বললো। খাস পাকিস্তানী উর্দুতে শোয়েবকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি উর্দু কথা বোঝো?

কিছুটা বুঝি।

নিশ্চয় হিন্দি ভালো বোঝে। তোমাদের বয়সী ছেলেরা তো খুব জিটিভি দেখে। বলে একটু হাসলো পাকিস্তানী।

শোয়েব বাংলায় বললো, উর্দুর চেয়ে হিন্দি বাঙালিদের জন্য বোঝা সহজ।

বাড়িতে তোমার কে কে আছে।

বাবা, মা, দুই ভাই, এক বোন।

তুমি কি সবার বড়?

ভাইদের ভেতর আমি বড়। সবার বড় বোন।

তোমার বোন কি করে?

কিছু করে না। অনার্স পাশ করে ঘরে বসে আছে।

বোনকে নিশ্চয় তুমি বেশি ভালোবাসো।

ভাই বোন বাবা মা সবাইকে ভালোবাসি।

তুমি খুব ভালো ছেলে।

শোয়েব কোনও কথা বললো না বেয়ারা এসে তিন কাপ কফি আর দামী ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কিট দিয়ে গেলো। শোয়েব বললো, আমার সঙ্গীদের রেখে কফি খেতে আমার খুব খারাপ লাগছে।

মাথা নেড়ে সায় জানালো পাকিস্তানী। বেয়ারাকে বললো, এই সাহেবের সঙ্গে যারা এসেছে তাদের কফি আর নাশতা দাও।

শোয়েব কফির কাপে চুমুক দিলো। সারা দিনের ক্লান্ত বিধ্বস্ত শরীরে কফি খেতে খুব ভালো লাগলো ওর। কফির সঙ্গে চারটা বিস্কিটও খেলো। এখনও ও বুঝতে পারছে না আলোচনা কোন দিকে গড়াচ্ছে। গোঁফওয়ালা যদি পাকিস্তানী হয় কালোসাদা দাড়ি নিশ্চয় জামাতী। মাহবুব যখন ওদের এখানে এসেছে ওরা নিশ্চয় শোয়েবের পরিচয় জানে। কাগজের ব্যাপার নিয়ে জেরা করার জন্য এত ভনিতা করছে কেন ও বুঝতে পারছিলো না। মনে মনে ঠিক করলো সেও সহযোগিতার ভান করে ওদের মতলব বোঝার চেষ্টা করবে।

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে পাকিস্তানী সিগারেট ধরিয়ে শোয়েবের দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলো।

ধন্যবাদ, আমি স্মোক করি না।

তুমি আসলেই ভালো ছেলে।

ধন্যবাদ।

একগাল ধোঁয়া ছেড়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে পাকিস্তানী বললো, তোমাকে যেভাবে ধরে এনেছে এর জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

আমরা কিন্তু এখনও জানি না আমাদের এখানে কেন আনা হয়েছে।

তুমি আমাদের কিছু দরকারী কাগজ চুরি করেছে। এতক্ষণ পর কথা বললো সাদাকালো দাড়িওয়ালা লোকটা। পাকিস্তানীর মতোই নিচু মোলায়েম গলায় বললো, কাগজগুলো আমাদের দরকার।

কাগজ আমার সঙ্গে নেই।

জানি। কোথায় আছে বলে দাও। আমাদের লোক গিয়ে নিয়ে আসবে।

কয়েক মুহূর্ত ভেবে শোয়েব বললো, ওগুলো আমি ইকবাল স্যারের বাসায় রেখেছি।

তুমি ওঁকে একটা চিঠি লিখে দাও। আমি এখনই লোক পাঠাচ্ছি।

লোক পাঠালে হবে না। আমাকে যেতে হবে। ইকবাল স্যারকে বলেছি আমি ছাড়া কাউকে যেন ওগুলো না দেন।

অনুত্তেজিত গলায় সাদাকালো দাড়ি বললো, তুমি এমনভাবে চিঠি লেখো যাতে তিনি ওগুলো দিতে বাধ্য হন।

আমি কি লিখবো আমরা বিপদে পড়েছি। কাগজগুলো না পাঠালো আমাকে খুন করা হবে।

তা কেন লিখবে? আমি যা বলবো তাই লিখবে। এই বলে লোকটা পাকিস্তানীর দিকে তাকালো জনাব, মেহেরবাণী করে টুকরো কাগজ আর কলম দিন।

মৃদু হেসে পাকিস্তানী ওর টেবিলের ড্রয়ার থেকে কাগজ আর বলপেন বের করে দিলো। সাদাকালো দাড়ি কাগজের টুকরোটা শোয়েবের দিকে এগিয়ে দিলো লেখো। বলে লোকটা কয়েক মিনিট ভাবলো। তারপর বললো, স্যারকে ডাকার সময় কি তাদের নাম উচ্চারণ করো?

না শুধু স্যার বলি।

ঠিক আছে, লেখো। স্যার, আপনাকে আমি যে কাগজগুলো দিয়েছিলাম ওগুলো ঢাকার সাংবাদিকরা চাইছেন। আমি জরুরী কাজে কক্সবাজারে আটকে যাওয়ায় আমার ভাইকে পাঠাচ্ছি। ও খুবই বিশ্বস্ত ছেলে, এখানে নির্মূল কমিটি করে। কাগজগুলো আজ রাতে পেলেই ভালো হত। সাংবাদিকদের যে দলটা আজ সকালে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কক্সবাজার এসেছিলো তাদের অনেকেই থেকে গেছে। জনকণ্ঠ ওটা প্রথম পাতায় ছাপাতে চায়। এই সুযোগ আমাদের হারানো ঠিক হবে না। জনকণ্ঠের রিপোর্টার কাল চলে যাবে। আপনি যদি পত্রবাহকের হাতে কাগজগুলো পাঠিয়ে দেন খুব ভালো হয়। মনে হয় জামাতকে শেষ করতে আর বেশি সময় লাগবে না। ইতি শোয়েব।

ধীরে ধীরে ডিক্টেশন দিচ্ছিলো সাদাকালো দাড়ি। ওর কথা মতো লিখতে গিয়ে রাগে সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছিলো শোয়েবের। তবু চুপচাপ ওদের হুকুম তামিল করছিলো হাতে কিছু সময় পাওয়া যাবে বলে।

শোয়েবের লেখা শেষ হওয়ার পর দাড়িওয়ালা ওটা ভালো মতো পড়ে দেখলো। কে জানে কোথাও কোনও চালাকি করেছে কি না? এই ইবলিশগুলো পারে না এমন কাজ আল্লার দুনিয়াতে নেই। কী রকম শয়তানী করে ওদের ছাত্র সংগঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মীর ঘর থেকে গোপন কাগজগুলো চুরি করেছে কথাটা ভাবতে গিয়ে কক্সবাজারের আমীর মওলানা রুহুল আমীন বার বার অবাক হয়েছে। খবরটা ঢাকা পর্যন্ত চলে গেছে। যে কোনও মূল্যে কাগজগুলো উদ্ধার করতে হবে। কাগজগুলো উদ্ধার না করা পর্যন্ত শয়তানটাকে কিছু করা যাবে না। চিঠি পড়ে সাদাকালো দাড়ি রুহুল আমিন ওদের পাকিস্তানী বন্ধু আসলাম গুলের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসলো–জনাব ঠিকই বলেছেন। এই ছেলেটা আসলেই ভালো। মনে হয় খারাপ লোকদের সঙ্গে থেকে একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। আমাদের মদদ পেলে জরুরি তরক্কী করবে। এই বলে চিঠি হাতে নিয়ে ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আসলাম গুল মৃদু হেসে বললো, বেটা শোয়েব, আমি তোমার বাড়ির সব খবর জানি। তোমার আব্বা তো আগামী বছর চাকরি থেকে রিটায়ার করবেন।

শোয়েব মাথা নেড়ে সায় জানালো।

তুমি যদি ঠিক ঠিক মতো পাশ করে না বের হও ভাবতে পারো কী হবে?

আমি ভালোভাবেই পাশ করবো।

আমি জানি তুমি লেখাপড়ায়ও ভালো। তবে বহু ফার্স্ট ক্লাস এখনও চাকরি পায়নি, ঠিক কি না বলো।

এবারও শোয়েবকে সায় জানাতে হলো। পাশ করে বেরুলেই যে চাকরি পাবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই।

বিশেষ করে ওর জন্য কোথাও চাকরির সুপারিশ করতে পারে এমন মামা চাচা তিন কূলেও নেই।

আসলাম গুল এতক্ষণ সূতো ছেড়ে ছেড়ে মাছ খেলানোর মতো করে শোয়েবকে খেলাচ্ছিলো। ওর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য বললো, আমি কিন্তু তোমাকে এখনই একটা চাকরি দিতে পারি।

কী চাকরি?

তুমি অনুমান করো।

আমাকে কি জামাত করতে হবে?

আরে না, তুমি কেন জামাত করবে? তোমাকে জামাতের লোকেরা বিশ্বাসই বা করবে কেন? তুমি বরং জামাতের বিরুদ্ধে কাজ করবে।

আসলাম গুলের কথা শুনে শোয়েব খুবই অবাক হলো। ও ধরেই নিয়েছিলো পাকিস্তানীটা জামাতের লোক। বিভ্রান্ত গলায় বললো, আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি আসলে কে?

আমি কে সেটা নিশ্চয় জানবে তুমি। আগে বলো তোমার চাকরির দরকার আছে কি না।

পড়াশোনার ক্ষতি করে বাবা মা আমাকে চাকরি করার অনুমতি দেবেন না।

পড়াশোনা করছো তো ভালো চাকরি পাওয়ার জন্য। তুমি অনার্স পাশ করেছে। যদি এই যোগ্যতা নিয়ে এম এ পাশের চেয়ে ভালো চাকরি করতে পারে সেটা ছাড়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে শোয়েব বললো, আমাকে একটু ভাবতে হবে। বাবার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

তোমার বাবা আপত্তি করবেন না।

আপনি কিভাবে জানেন বাবা আপত্তি করবেন না?

তোমার বাড়ির খবর তোমার চেয়ে বেশি আমি জানি।

মানে?

তুমি কি জানো তিন দিন আগে তোমার বোন সায়মার জন্য ভালো একটা বিয়ের প্রস্তাব এসেছে?

অবাক হয়ে শোয়েব বললো, না জানি না।

ছেলেটা ডাক্তার। আমেরিকায় যাবার একটা সুযোগ পেয়েছে। এমনিতে কোনও যৌতুক নেবে না। আমেরিকা যাওয়ার জন্য ওকে এক লাখ টাকা দিতে হবে।

টাকা দিয়ে বোনের বিয়ে দেবো না।

শোয়েব বেটা, ইমোশনাল হচ্ছে কেন? তোমার বোনের গায়ের রং কালো। দেখতেও খুব সুন্দর নয়। তোমরা ভাইরা হয়েছে মার মতো, বোনটা হয়েছে বাবার মতো। এই বোনের জন্য এর চেয়ে ভালো ছেলে পাবে না। তোমার বাবা মা দুজনই ছেলে দেখে মুগ্ধ। আসলে ছেলেটা তোমার বোনের প্রেমে পড়েছে। নইলে অনেক সুন্দর মেয়ে ও বিয়ে করতে পারতো।

বড় বোন কার সঙ্গে প্রেম করে শোয়েব সেসব কথা জানে না। পাকিস্তানীটা যে ওদের হাড়ির খবর পর্যন্ত জানে এতে কোনও সন্দেহ নেই। বোন যদি ছেলেটাকে পছন্দ। করে ওদের বিয়ে হলে নিশ্চয় খুব ভালো হবে। কিন্তু এক লাখ কেন পঞ্চাশ হাজার টাকা যোগাড় করাও ওর বাবার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রাইভেট ফার্মে চাকরি টিকিয়ে রাখাই কঠিন। গত বছর বাবাদের কোম্পানির পুরোনো মালিক মারা যাওয়ার পর তার ছেলে নতুন এমডি হয়েছে। পয়লা মাসেই দশজনকে ছাঁটাই করেছে। বাবার চাকরি

অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। তিনি অফিস থেকে এখন এক মাসের বেতন অগ্রিম চাইতেও সাহস পান না।

কোত্থেকে বোনের বিয়ের টাকা জোগাড় করবেন?

আসলাম গুল মোলায়েম গলায় বললো, বেটা শোয়েব, তুমি কী ভাবছো আমি বুঝতে পারছি। তোমাকে আমরা এমন কাজ দেবো যে লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকেই তুমি তা করতে পারবে। পাশ না করা পর্যন্ত পার্ট টাইম। পাশ করে বেরুলে ফুল টাইম।

সঙ্গে সঙ্গে শোয়েব ভুলে গেলো ও কোথায় আছে, কার সঙ্গে কথা বলছে। গত এক বছর ধরে ও চেষ্টা করছে একটা টিউশনি জোগাড়ের জন্য, পারেনি। কখনও বাবার টাকা পাঠাতে দু চার দিন দেরি হলে চোখে ও অন্ধকার দেখে।

ব্যগ্র গলায় বললো, আমি চাকরি করবো। বলুন, কী করতে হবে আমাকে।

তুমি তো ছাত্র ফ্রন্ট করো, তাই না?

হ্যাঁ। শোয়েব বুঝতে পারলো না চাকরির সঙ্গে ছাত্র ইউনিয়নের কী সম্পর্ক।

ছাত্র ইউনিয়নের অনেক ছেলে ছাত্রলীগে জয়েন করেছে তাই না?

হ্যাঁ করেছে।

তুমি করছো না কেন?

বারে খামখা কেন ছাত্রলীগ করবো। কলেজ থেকেই আমি ছাত্র ফ্রন্ট করি। ক্যাম্পাসে আমার বন্ধুরাও সবাই ছাত্র ফ্রন্ট করে।

আমি জানি। তোমরা সবাই মিলে ছাত্রলীগে জয়েন করো।

বিনা কারণে কেন ছাত্রলীগ করতে যাবো? গত মাসেই মেডিক্যালে লীগের সঙ্গে আমাদের মারামারি হয়েছে।

জানি। তুমি ছাত্রলীগে জয়েন করবে তোমার বন্ধুদের নিয়ে–এটা হচ্ছে তোমার চাকরির একটা শর্ত।

আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না। অবাক হয়ে শোয়েব বললো, আপনি কি ছাত্র লীগ করার জন্য আমাকে চাকরি দেবেন?

ঠিক ধরেছে।

আওয়ামী লীগের নেতারা বুঝি এখন টাকা দিয়ে কর্মী কিনছে?

আমি আওয়ামী লীগের কোনও নেতা নই। একজন ওয়েল উইশার বলতে পারো।

আপনি আসলে কী চান?

দেখো বেটা, আওয়ামী লীগ দল হিসেবে খুবই বড় এতে কোনও সন্দেহ নেই। তোমাদের আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জিতবে বলে আমরা মনে করি। তবে দুঃখের কথা হচ্ছে এই দলের বেশির ভাগ নেতা ভারতের দালাল। ক্ষমতায় গেলে বাংলাদেশকে তারা ভারতের কাছে বিক্রি করে দেবে।

আসলাম গুলের কথার কোনও খেই ধরতে পারছিলো না শোয়েব। কখনও ওকে মনে হচ্ছে জামাতের লোক, কখনও মনে হচ্ছে আওয়ামী লীগের, এখন মনে হচ্ছে বিএনপির। বললো, বিএনপির লোকেরা আওয়ামী লীগকে ভারতের দালাল বলে।

না, শুধু বিএনপি বলে না, সাধারণ পাবলিকও বলে।

পাবলিক যদি বিশ্বাস করবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ইন্ডিয়ার কাছে বাংলাদেশকে বিক্রি করে দেবে, তারপরও কি আওয়ামী লীগ ইলেকশনে জিতবে?

জিতবে। কারণ বিএনপির ভেতরও অনেক ইন্ডিয়ান এজেন্ট আছে। আর্মিতেও আছে। অরাও চায় ইলেকশনে এবার আওয়ামী লীগ জিতুক।

আপনি কী চান সেটাই তো বলছেন না।

আমিও চাই ইলেকশনে আওয়ামী লীগ জিতুক।তবে জিতে যেন বাংলাদেশকে ইন্ডিয়ার হাতে তুলে দিতে না পারে সেটা আমাদের দেখতে হবে।

আমার কাজটা কি হবে?

তুমি যদি রাজনীতিটা একটু বোঝার চেষ্টা করো কাজটা তোমার জন্য সহজ হয়ে যাবে। তোমরা এখন কোথাকার এক জাহানারা ইমামের কথায় জামাতের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করছে। ক্ষমতায় যদি যেতে চাও আক্রমণের লক্ষ্য হবে যে দল ক্ষমতায় আছে তারা, জামাত কখনও আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় যাওয়া আটকাতে পারে না, পারে শুধু বিএনপি। বিএনপি ক্ষমতায় এসে যে সব দুর্নীতি করছে মানুষ যদি তা জানে তাহলে বিএনপিকে ওরা আগামী বার ভোট দেবে না। ছাত্রদলের কথাই ধরো। তোমরা মারামারি করছে শিবিরের সঙ্গে। ওদিকে বিএনপি একটার পর একটা কলেজ দখল করে ফেলছে। আওয়ামী লীগের রাজনীতি দেখে মনে হয় ওরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য রাজনীতি : করছে না, ইন্ডিয়াকে খুশি করার জন্য যখন যা করা দরকার করছে।

আমার কাজ কী হবে? নির্দিষ্টভাবে জানতে চাইলো শোয়েব।

শুধু তোমার নয়, তোমাদের সবার কাজ হবে আওয়ামী লীগ যে ভারতের দালাল। নয়, সত্যিকারের একটা দেশপ্রেমিকদের দল এটা প্রমাণ করা। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ইন্ডিয়াকে পছন্দ করে না। ইন্ডিয়া ফারাক্কার পানি বন্ধ করে দিয়েছে। গোটা উত্তরবঙ্গ বিরান মরুভূমি হয়ে গেছে। ইন্ডিয়ার জন্য এখানে কোনও ইন্ডাস্ট্রি হতে পারছে না। যে বাংলার জন্য তোমরা জীবন দিয়েছে সেই তোমরা সারাদিন টেলিভিশনে হিন্দি প্রোগ্রাম দেখো। বাঙালি জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে যদি তোমরা ইন্ডিয়ার খপ্পর থেকে বেরুতে না পারো।

শোয়েব গম্ভীর হয়ে বললো, ইন্ডিয়ার দালালি না করা এক জিনিস আর ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ইন্ডিয়াকে গালি দেয়া আরেক জিনিস।

গালি দিতে কে বলছে তোমাকে? তোমরা বলো তিরিশ লাখ মানুষ বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য শহীদ হয়েছে, নিশ্চয় তারা, ইন্ডিয়ার সঙ্গে পঁচিশ বছরের গোলামি চুক্তি চায়নি।

ইন্ডিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের একটা চুক্তি হয়েছিলো এটা শোয়েব জানে। অনেকে এটাকে গোলামি চুক্তি বলে কিন্তু ও নিজেও জানে না চুক্তিতে কী আছে।

আসলাম গুলের কথাগুলো খুব নির্মম শোনালেও–যুক্তি যে আছে এটা শোয়েব অস্বীকার করতে পারলো না।

শোয়েবের চেহারা দেখে আসলাম গুল বুঝলো ওষুধ ধরেছে। বললো, বাংলাদেশ একটা রাষ্ট্র হিসেবে ছোট হতে পারে, কিন্তু ভুলে যেও না বাঙালি জাতির কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস রয়েছে। বাঙালি মুসলমানদের মতো সাহসী যোদ্ধা জাতি পৃথিবীতে খুব কমই আছে। এই জাতিকে নেতৃত্ব দেয়া খালেদা জিয়ার বিএনপির মতো দলের পক্ষে সম্ভব নয়। জিয়াউর রহমান বেঁচে থাকলে না হয় কথা ছিলো। দেশের অবস্থা এখন এমনই দাঁড়িয়েছে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আসতে হবে। এটা শুধু মনে চাইলে হবে না, এর জন্য কাজ করতে হবে, সঠিক কৌশল বের করতে হবে।

কৌশলটা কী?

যুদ্ধের একটা সাধারণ নিয়ম হচ্ছে এক গুলিতে তুমি একজনকেই মারতে পারো। যদি ভাবো এক গুলিতে তুমি তিনজনকে মারবে তাহলে দেখা যাবে একজনকেও তুমি মারতে পারোনি। ক্ষমতায় যেতে হলে শুধু বিএনপিকে টার্গেট করো। বিএনপির বিরুদ্ধে যারা লড়তে চায় তাদের একাট্টা করো। দেখবে আগামী নির্বাচনে বিএনপির নাম নিশানা থাকবে না।

আসলাম গুলের প্রস্তাব না মানার কোনও কারণ খুঁজে পেলো না শোয়েব। ওকে যদি বলতো টাকা দেবো জামাত করো, কিংবা বিএনপিতে জয়েন করো, তাহলে সেটা মানা ওর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। আওয়ামী লীগের যত দোষই থাক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সবচেয়ে বড় দল আওয়ামীলীগই। যতই ছাত্র ইউনিয়ন করুক ওদের দল সিপিবি কোনও দিন ক্ষমতায় যেতে পারবে না।

শোয়েবকে কিছুক্ষণ ভাববার সুযোগ দিয়ে আসলাম গুল বললো, তাহলে এই কথাই থাকলো। তুমি আর তোমার বন্ধুরা ছাত্র লীগে জয়েন করছে।

শোয়েবের মুখে হাসি ফুটলো। বললো, করবো।

তাহলে সামনের মাসে আমি তোমার বাবাকে এক লাখ টাকার বন্দোবস্ত করে দেবো। তবে তুমি ছাত্র যতদিন আছো মাসে দুহাজারের বেশি পাবে না।

বলে কী, দু হাজারের বেশি পাবে না। মাসে এক হাজার টাকা পেলেই শোয়েব বর্তে যায়। দুহাজার পেলে তো কথাই নেই। বললো, শুধু ছাত্র লীগে জয়েন করলে চলবে, না আর কিছু করতে হবে?

কিছু কিছু প্রোগ্রাম নিতে হবে। তবে তার জন্য ফান্ডের কোনও অভাব হবে না। সবার আগে আওয়ামী লীগের শরীর থেকে ইন্ডিয়ার দালালির গন্ধটুকু ভালো মতো মুছে ফেলতে হবে। এই বলে আসলাম বেগ উঠে দাঁড়ালো–রহমত তোমাকে তোমাদের ঘরে পৌঁছে দেবে। তিন দিন তোমাকে আমাদের মেহমান হয়ে থাকতে হবে।

শোয়েব যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে বললো, আমার সঙ্গে যে তিনটা ছেলেকে ধরে আনা হয়েছে ওদের কী হবে?

আজ রাত হয়ে গেছে। কাল ওরা যেখানে যেতে চায় সেখানে পৌঁছে দেয়া হবে। তোমার চাকরির ব্যাপারটা আশা করি গোপন থাকবে। এই বলে, আসলাম গুল কলিং বেল টিপতেই বিহারী রহমত ঘরে ঢুকে বললো, হুকুম কিজিয়ে মালিক।

সাবকো আপনা কামরা দেখাও।

চলিয়ে জনাব। অত্যন্ত বিনীত গলায় কথাটা বলার চেষ্টা করলো কর্কশভাষী বিহারীটা।

.

৯.

আসলাম গুলের সঙ্গে কথা বলে শোয়েব এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলো যে ওকে আর দড়ি দিয়ে বাঁধা হবে না। বদমাশ বিহারীটা এত শক্ত করে বেঁধেছিলো যে তখনও ব্যথা যায়নি। ভেবেছিলো মাটির নিচে

আগে যে ঘরে এনে রেখেছিলো সেখানেই বুঝি ঢোকাবে। শোয়েবকে অবাক করে দিয়ে বিহারীটা ওকে এমন এক ঘরে এনে ঢোকালো দেখে মনে হলো কোনও অভিজাত হোটেলের কামরা। বেশ বড় ঘর, দুদিকের দেয়াল ঘেঁষে দুটো ডবল খাট, বড় ওয়ার্ডরোব, ড্রেসিং টেবিল, রাইটিং টেবিল, চারটা গদি মোড়া নরম চেয়ার–আরামের সব উপরকণ পরিপাটি করে সাজানো। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুমের দরজা খোলা ছিলো। শোয়েবের চোখে পড়লো বাথরুমে বেদিং টাবও আছে। কক্সবাজারের জঙ্গলের ভেতর এমন রাজসিক আয়োজন দেখে শোয়েবের বার বার মনে হচ্ছিলো ও বুঝি স্বপ্ন দেখছে।

বিহারীটা ওকে ঘর দেখিয়ে বললো, কামরা পসন্দ হুয়া?

মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে গম্ভীর গলায় শোয়েব বললো, আমার সঙ্গে যারা ছিলো তারা কোথায়?

আপ বায়ঠিয়ে। উনলোগকো অভি লাতা হুঁ। এই বলে বিহারী ঘরের দরজা টেনে দিয়ে চলে গেলো। শোয়েব দরজার নব ঘুরিয়ে দেখলো ওটা খোলাই আছে। তার মানে ওরা ধরে নিয়েছে এখন থেকে শোয়েব ওদের একজন। নরম বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ও আসলাম গুলের সঙ্গে পুরো আলোচনাটা প্রথম থেকে মনে করার চেষ্টা করলো। ঘন্টা খানেক আগে যেখানে আশঙ্কা করছিলো ওরা ওকে কত নৃশংসভাবে খুন করতে পারে, একঘন্টা পর ওদের রাজকীয় আতিথেয়তায় ওর বিচার বুদ্ধি সব গুলিয়ে গেলো। আসলাম গুলের সঙ্গে বৈঠকের কথা ভাবতে গিয়ে ওর মনে পড়লো এতক্ষণ কথা বলার পরও লোকটার নাম জানা হয়নি। পাকিস্তানী হয়ে ও হঠাৎ এত বাংলাদেশ দরদী কেন হলো তাও জানা যায়নি। জিজ্ঞেস করা উচিৎ ছিলো একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী যে তিরিশ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছে সে সম্পর্কে ওর বক্তব্য কী।

মিনিট পনেরো পর দরজা খোলার শব্দ হলো। শোয়েবকে এমন রাজকীয় বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে সুমন, ঝন্টু আর রবির চোখগুলো মার্বেলের মতো গোল হয়ে গেলো, চোয়াল ঝুলে গেলো, বিস্ময়ের ধাক্কায় কিছুক্ষণের জন্য সবাই হতবাক হয়ে গেলো।

বিহারীটা সুমনদের ঘরে রেখে দরজা টেনে বন্ধ করে চলে গেছে। বিছানার শোয়া থেকে উঠে বসলো শোয়েব। মৃদু হেসে বললো, কী হলো, খুব অবাক লাগছে তাই না?

সুমন নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, মনে হচ্ছে আলাউদ্দিনের প্রদীপ হাতে পেয়েছো শোয়েব ভাই।

অনেকটা তাই। তোমাদের মতো আমারও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। মৃদু হেসে জবাব দিলো শোয়েব।

ঝন্টু অধীর আগ্রহে জানতে চাইলো–কী হয়েছে সব খুলে বলল।

বলছি। আগে বস তো।

সুমনদের সোফায় বসিয়ে শোয়েব দরজা খুলে গলা বাড়িয়ে ডাকলো–রহমত।

প্রথম ডাকে কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেলো না। করিডোরে অন্য কোনও লোক নেই, সবগুলো ঘরের দরজা বন্ধ। গলাটা এক ধাপ উঁচু করে শোয়েব আবার ডাকলো–রহমত।

এবার দূর থেকে বিহারীর গলা শোনা গেলো আয়া সরকার।

একটু পরে, কোত্থেকে হন্তদন্ত হয়ে এসে রহমত বললো, ফরমাইয়ে সরকার।

শোয়েব সামান্য কর্তৃত্ব মেশানো গলায় বললো, চার কাপ কফি দিতে পারবে?

জরুর সরকার। বলে ও ব্যস্ত পায়ে চলে গেলো।

এসব কী হচ্ছে শোয়েব ভাই? আল্লার কসম, আমাদের আর সাসপেন্সে রেখো না।

শোয়েব আসলে ভাবছিলো আসলাম গুলের সঙ্গে চাকরির ব্যাপারে যে কথা হয়েছে সেটা এদের বলা ঠিক হবে কি না। রাজনীতির এত মারপ্যাঁচ বোঝার বয়স এদের কারোই হয়নি। ঠিক করলো চাকরির প্রসঙ্গটি আপাতত গোপন রাখবে। আসলাম গুলও বলেছে চাকরির কথা কাউকে না বলতে।

সোফায় বসে শোয়েব চাকরির প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে ইকবাল স্যারকে চিঠি লিখে কিভাবে ওদের সহানুভূতি আদায় করেছে সেটুকু পুরোটাই বললো।

সব শুনে সুমন বললো, ইকবাল স্যারের কাছ থেকে তোমার কাগজ ওরা কিভাবে পাবে? তুমি তো নিয়ে এসেছে।

জানি পাবে না। তবু কয়েকটা ঘন্টা তো হাতে পাচ্ছি।

ভোর হওয়ার আগেই ওরা জানতে পারবে তুমি সত্যি কথা বলোনি।

ইকবাল স্যারও তো মিথ্যে বলতে পারেন।

তুমি কী এটা ওদের বোঝাতে পারবে?

মনে হয় পারবো।

তবু কাগজ না পাওয়া পর্যন্ত ওরা তোমাকে ছাড়বে না।

তা ছাড়বে না। তবে ওদের কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছি–তোমাদের ওরা কাল সকালে ছেড়ে দেবে। যেখানে যেতে চাও পৌঁছে দেবে।

রবি একটু বিরক্ত হয়ে বললো, সামান্য কটা কাগজের জন্য তুমি কেন নিজের ওপর এত বড় ঝুঁকি নিচ্ছো শোয়েব ভাই। ওগুলো দিয়ে দাও না শোয়েব ভাই।

যতক্ষণ না দিচ্ছি ততক্ষণই ওরা আমাকে পাত্তা দেবে। কাগজ হাতে পেলে ওদের প্রথম কাজ হবে আমাকে মেরে ফেলা। আমি কাগজ খুঁজে বের করার জন্য সময় নেবো।

তাতে লাভ কী হচ্ছে? জানতে চাইলো ঝন্টু–তুমি কি মনে করো ততদিন এসব কাগজের কথা কোথাও ফাস করতে পারবে?

তা হয়তো পারবো না। তবে ততদিন বেঁচে থাকবো–এটাই বা কম কী।

একটা বড় ট্রেতে রহমত কফি, বিস্কিট আর পাপড় ভাজা এনে ওদের সামনের সেন্টার টেবিলে রাখলো। রবি আহ্লাদী গলায় বললো, থ্যাঙ্ক ইউ রহমত ভাই, বহুৎ শুকরিয়া।

রহমত হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। রবি বললো, কাল যখন ওরা কাগজ পাবে না মনে হয় আমাদেরও যেতে দেবে না।

না দিক দড়ি দিয়ে যখন আমাদের বেঁধে রাখেনি তখন পালাতে আর কী লাগে। বললো ঝন্টু।

শোয়েব নিজেও খুব সিরিয়াসলি ভাবছিলো, কাগজ না পেয়ে রুহুল আমীনের লোক ফিরে আসবে তখন ও কী জবাব দেবে? কাগজ নিয়ে যদি ওদের ঘোরায় তাহলে আসলাম গুলও ওকে চাকরির নামে ঘোরাবে। মনে মনে ঠিক করলো। কাগজগুলো কোনও অবস্থায় ওদের দেবে না। আসলাম গুল চাকরি না দিলে নিজের কষ্টের পরিমাণ একটু বেশি হবে। তাই বলে যারা দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করছে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জেনেও মুখ বুজে থাকবে–এটা কখনও হতে পারে না।

কক্সবাজারের ডিসি হাবিবুল বাশার একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। গত বছর ওকে যখন কক্সবাজারে বদলি করা হয় তখনই ঠিক করেছেন সুযোগ পেলেই জামাতীদের ঘাঁটিতে হামলা করবেন। নতুন এসপি যিনি এসেছেন তিনিও একজন মুক্তিযোদ্ধা তাঁর কাছেই খবর পেয়েছেন বার্মা থেকে যেসব রোহিঙ্গা মুসলমান কক্সবাজার এসে আশ্রয় নিয়েছে জামাতীরা ওদের সাহায্য করার নাম করে পাকিস্তান আর সৌদি আরব থেকে অনেক টাকা আর অস্ত্র এনেছে। এসপি নওশের আলীকে তিনি বলেছেন জামাতের নেতাদের ওপর কড়া নজর রাখতে।

সুমনের বাবা তার ছেলেবেলার বন্ধু। ওর ছেলেকে উদ্ধার করার জন্য জামাতীদের কয়েকটা ঘাটি যদি রেইড করা যায়–এ নিয়ে সন্ধ্যের পরই তিনি এসপির সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। রাত নটা নাগাদ ওঁদের ইনফর্মার খবর আনলো শহর থেকে তিন মাইল দূরে জামাতীদের একটা শক্ত ঘাঁটি আছে। সুমনদের সেখানেই আটকে রাখা হয়েছে। পাশের গ্রামের লোকেরা দেখেছে ওদের সঙ্গে আরেকটা ছেলে

ছিলো, যাকে প্রায়ই এ তল্লাটে দেখা যায়। ইনফর্মারের কথা শুনে মনে হলো সেখানে বন্দুক রাইফেল, মেশিনগান ছাড়াও রকেট লাঞ্চার আছে।

এসপি নওশের আলী কথা বললেন বিডিআরের এরিয়া কমান্ডারের সঙ্গে। রোহিঙ্গাদের নিয়ে বিডিআর কমান্ডারও খুব উত্যক্ত ছিলেন। বললেন, তিনিও ফোর্স পাঠাবেন।

মাঝ রাতে পুলিশ আর বিডিআররা আসলাম গুল আর রুহুল আমীনদের ঘিরে ফেললো। শোয়েবরা তখন পোলাও, রোস্ট আর রেজালা দিয়ে নৈশভোজ সেরে গভীর ঘুমে অচেতন। ডিসি আর এসপি মিলে ঠিক করেছেন হামলা চালাবেন গেরিলা কায়দায়। পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি বয়স হলেও দুজনেই সেই রাতে একাত্তরের দিনগুলোয় ফিরে গিয়েছিলেন। দুজনেই অনুভব করছিলেন সেই একই রকম উদ্দীপনা। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ খবর পেয়েছে, পাকিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগ আইএস আইর লোকজনও নাকি গোপনে রোহিঙ্গাদের ভেতর কাজ করছে। শোয়েব বুঝতে পারেনি আসলাম গুল যে আই এস আইর একজন বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞ। আইএসআইর রাজনৈতিক ডেস্কে কাজ করে পাকিস্তানে আর্মির রিটায়ার্ড মেজর আসলাম গুল। একাত্তরে নিজ হাতে কত বাঙালিকে যে সে নিজে মেরেছে এখনও বন্ধু মহলে জাক করে বলে বেড়ায়।

দু বছর ধরে কোন এক জাহানারা ইমাম জামাতের বিরুদ্ধে সবাইকে নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে। ইসলামাবাদে আসলাম গুলের অফিস সব খবরই রাখে। আওয়ামী লীগের সঙ্গে বামপন্থী দলগুলোও জাহানারা ইমামের পেছনে গিয়ে জুটেছে।

প্ল্যানটা অতি যতের সঙ্গে বানিয়েছিলো আসলাম গুল। সবার আগে আওয়ামী লীগকে জাহানারা ইমামদের খপ্পর থেকে বের করে আনতে হবে। এমন একটা অবস্থা তৈরি করতে হবে আওয়ামী লীগ যেন জামাতের বিরুদ্ধে না গিয়ে ওদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করে। আওয়ামী লীগের নেতাদের বোঝাতে হবে একমাত্র এই কৌশলেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যেতে পারে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাওয়ার আগে কি একাত্তরের খুনীদের বিচার সম্ভনাকি যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে তাদের বিচার সম্ভব।

শোয়েবকে যখন থেকে জামাতীরা টার্গেট করেছে তখনই ওর সম্পর্কে সব খোঁজ খবর নিয়েছে আসলাম গুল। ওর লক্ষ্য হচ্ছে একটু অভাবী পরিবারের উচ্চাকাঙ্খী ছেলেরা। শোয়েবদের পরিবারের পুরো অবস্থা জেনে ঠিক করেছে এই ছেলেকে দলে টানতে হবে। সারা দেশে শোয়েবের মতো অন্ততপক্ষে শ পাঁচেক ছেলে দরকার আসলাম গুলের। শোয়েবের কাছে কী গোপন কাগজ আছে এ নিয়ে ওর মাথা ব্যথা নেই। জামাতের নেতা রুহুল আমীনকে বলে দিয়েছে কাগজ পাক নাই পাক

শোয়েবকে যেন কিছু না বলে। এই ছেলেকে হাতে রাখার জন্য বাকি তিনটাকে ছেড়ে দিতে বলেছে আসলাম গুল। রুহুল আমীন অবশ্য প্রথমে আপত্তি করেছিলো। আসলাম গুল পাত্তা দেয়নি। দুদিন পর এই জায়গাটা এমনিতেই ছেড়ে দিতে হচ্ছে। জানাজানি হলে অসুবিধে নেই। আসলাম গুল এখানে এসেই ঠিক করেছে ওদের ঘাঁটি পুব দিকে পাহাড়ের ওপাশে আরও দুর্গম এলাকায় সরিয়ে নিতে হবে। গত সাত দিন ধরে অস্ত্রপাতি সব সেই ঘাঁটিতে গোপনে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। কালকের মধ্যে কাগজপত্রও সব চলে যাবে। শোয়েবকে পটাতে পেরে সেই রাতে আসলাম গুলও নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিলো।

.

ডিসি হাবিবুল বাশার আর এসপি নওশের আলী কক্সবাজারে জামাতীদের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটিতে হামলা করতে এসে যে ধরনের প্রতিরোধের আশঙ্কা করেছিলেন সে রকম কিছুই হলো না। ওরা প্রথমে গেরিলা কায়দায় অতর্কিতে আক্রমণ করে পাহারাদারদের কাবু করে ফেলেছিলেন। শুধু শেষ পাহারাদারটা টের পাওয়াতে ঝামেলা বেঁধেছিলো। লোকটা জেগেই ছিলো। দূরে অন্ধকারে কয়েকটা কালো ছায়াকে সন্দেহজনকভাবে ছুটোছুটি করতে দেখে ও কটকট করে মেশিনগান চালিয়েছে। তিরিশ রাউন্ড গুলি হওয়ার পর ও পেছন থেকে নওশের আলীর পিস্তলের গুলি খেয়ে পড়ে গেলো।

পাহারাদারদের কাবু করে এসপি হ্যান্ড মাইকে ঘোষণা দিলেন, সারা এলাকা পুলিশ আর বিডিআর ঘিরে ফেলেছে। ভেতরে যারা আছো মাথার ওপর দুই হাত তুলে বেরিয়ে এসো। নইলে সবাই বেঘোরে মারা পড়বে।

নওশের আলী ভেবেছিলেন তাঁর কথার মাঝখানেই বুঝি চারদিক থেকে মেশিনগানের গুলি ছুটে আসবে। বেশ কয়েকবার ঘোষণাটার পুনরাবৃত্তি করার পরও কোথাও থেকে মেশিন গান বা রাইফেল দূরে থাক পিস্তলের গুলির শব্দ পর্যন্ত হলো না। শেষে ভাবলেন শত্রুপক্ষ হয়তো চাইছে তারা ভেতরে যান। ঘুট ঘুঁটে অন্ধকারে ঘরের ভেতর থেকে গুলি ছুঁড়ে ওরা নিজেদের অবস্থান জানাতে চায় না। এসপি ঠিক করলেন ভোর হওয়া পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করবেন।

অপেক্ষা করার অবশ্য কোনও প্রয়োজন ছিলো না। মেশিনগানের গুলির শব্দ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া আর মাইকের ঘোষণাই আসলাম গুলদের বুঝিয়ে দিয়েছিলো ওরা যে বেকায়দায় পড়েছে। এরকম সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই এই ঘাঁটি বানানো হয়েছিলো। পালাবার জন্য মাটির নিচে সুড়ঙ্গ কাটা

হয়েছে পুব দিকে। মাইকের প্রথম ঘোষণার সঙ্গেই আসালাম গুল ওর সঙ্গীদের নিয়ে সুড়ঙ্গ পথে কেটে পড়েছে। শোয়েবরা আলাদা বাড়িতে ছিলো বলে বেঁচে গিয়েছিলো।

মেশিনগানের গুলির শব্দে শোয়েবদেরও ঘুম ভেঙেছে। মাইকের ঘোষণা শোনামাত্র রবি লাফিয়ে উঠে–আমাদের রেসকিউ টিম এসে গেছে, বলে বাইরে ছুটে যাচ্ছিলো।

সঙ্গে সঙ্গে শোয়েব ওকে থামিয়েছে–তুমি ক্ষেপেছো নাকি রবি? এক্ষুণি গোলাগুলি শুরু হবে। চুপচাপ ঘরে বসে অপেক্ষা করো। এই বলে ও ঘরের দরজা বন্ধ করে রিডিং টেবিলটা সরিয়ে এনে দরজার গায়ে লাগিয়ে রাখলো। যাতে সহজে ধাক্কা দিয়ে কেউ যেন খুলতে না পারে।

পর পর কয়েকবার মাইকে ঘোষণা হওয়ার পরও যখন এদিক থেকে সাড়া শব্দ হলো তখন সুমন বললো, মনে হয় এরা সবাই ভেগেছে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শোয়েব দরজা খুললো। বেশ কয়েকবার রহমত, রহমত, বলে ডাকলো। রহমতরা ততক্ষণে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে পুবের পাহাড়ের দিকে ছুটছিলো। পাহাড়ের ওপাশে গেলেই ওরা নিরাপদ।

রহমত বা অন্য কারও সাড়া শব্দ না পেয়ে শোয়েব করিডোর আর ঘরের সব আলো জ্বেলে দিলো। তাড়াহুড়ো করে যাওয়ার সময় রহমতরা জেনারেটর বন্ধ করার সুযোগ পায়নি।

বাইরে থেকে এসপি নওশের আলী আর ডিসি হাবিবুল বাশার দুজনই অবাক হয়ে দেখলেন ছড়ানো ছিটানো অনেকগুলো বাড়ির একটাতে একে একে আলো জ্বলছে। ভাবলেন নিজেদের অবস্থান জানাবার জন্য শত্রুপক্ষ নিশ্চয় বোকার মতো এমন কাঁচা কাজ করবে না। তবে কি শোয়েবরা আলো জ্বেলে সংকেত পাঠাচ্ছে? ভাবতে গিয়ে ওঁরা মনে মনে প্রমাদ গুণলেন। শত্রুপক্ষ টের পেলে শোয়েবদের আস্ত রাখবে না।

মিনিট দশেক অপেক্ষা করে শোয়েবরা বুঝে ফেললো এখানকার সবাই পালিয়েছে। তারপর মাথার ওপর হাত তুলে ফ্রেন্ডস, ফ্রেন্ডস, বলে বেরিয়ে এলো।

ডিসি হাবিবুল বাশার ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলেন, সুমন কে?

সুমন এগিয়ে যেতেই তিনি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি তোমার বাশার চাচা। তোমার বাবা অস্থির হয়ে পড়েছেন তোমাদের সবার জন্য।

বাবা কোথায়? জানতে চাইলো সুমন।

কক্সবাজারে, আমার বাসায়। আসতে চেয়েছিলো, বারণ করেছি। আমরা তো ভেবেছিলাম জামাতীদের সঙ্গে একাত্তরের মতো একটা যুদ্ধ হবে। ওরা এভাবে পালাবে। ভাবিনি।

শোয়েব বললো, শুধু জামাতী নয়। পাকিস্তানীও আছে ওদের সঙ্গে।

ডিসি হেসে বললেন, কক্সবাজার গিয়ে সব শুনবো। এখন গাড়িতে ওঠো। ওপাশে আমার জিপ আছে। এসপি এসে শোয়েবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বললেন সুমনদের গাড়িতে রাখা আপনার কাগজগুলো পেয়েছি। দারুণ কাজ করেছেন।

এরই জন্য বেচারার জানটা যেতে বসেছিলো। এই বলে ডিসি হাবিবুল বাশার ছেলেদের তাড়া লাগালেন, আমাদের আর দেরি করা চলবে না। বাকি কাজ পুলিশ করবে। চলল, আমরা কক্সবাজারে গিয়ে সানরাইজটা বীচে বসে দেখি।

সুমনরা সবাই ডিসির জিপের পেছনে উঠে বসলো। এসপি বললেন আপনারা যান, এদের ঘাটিটা ভালো করে সার্চ করতে হবে। দেখি কোনও সূত্রটুত্র ফেলে রেখে গেছে কি না।

ডিসির জিপ কক্সবাজারের পথে রওনা দিলো। সুমন বললো, আমাদের কক্সবাজার পৌঁছানোর কথা ছিলো কাল সন্ধ্যায়, মাত্র তেত্রিশ ঘণ্টা দেরি হয়েছে, অথচ মনে হচ্ছে এর ভেতর তেত্রিশ দিন কেটে গেছে।

হাবিবুল বাশার মৃদু হেসে বললেন, মনে হচ্ছে দারুণ একটা অ্যাডভেঞ্চারের অভিজ্ঞতা হয়েছে তোমাদের?

রবি বললো, এ্যাডভেঞ্চারই বটে। অল্পের জন্য পৈত্রিক প্রাণটা খোয়াতে হয়নি

ঝন্টু বললো, আসলেই এ্যাডভেঞ্চার। ভেবে দেখ প্রতিটা মুহূর্তে আমরা কিভাবে মৃত্যুর তাড়া খেয়ে ছুটছিলাম।

হাবিবুল বাশার মৃদু হেসে বললেন, কক্সবাজার চলো, তোমাদের সব কষ্ট পুষিয়ে দেবো।

কিভাবে আঙ্কল? জানতে চাইলে সুমন।

তোমরা আসছো শুনে আমার দুই মেয়ে মিনি আর নিনি চমৎকার একটা হলিডে প্ল্যান তৈরি করে রেখেছে। না, এর বেশি বলতে পারবো না। তাহলে ওরা আর আমার সঙ্গে কথাই বলবে না।

ওঁর কথা শুনে সুমন, ঝন্টু আর রবি এক সঙ্গে হেসে উঠলো।